অগ্নি-বীণা

কাজী নজরুল ইসলাম

অগ্নি-বীণা

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-জীবন

ভারতের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে) মঙ্গলবার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। তাঁর পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ ও মাতামহের নাম মুনশী তোফায়েল আলী। কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দুটি বিয়ে। সাতপুত্র এবং দুই কন্যার মধ্যে নজরুলের সহোদর বড়ভাই কাজী সাহেবজান, ছোটভাই কাজী আলী হোসেন এবং একমাত্র বোন উম্মে কুলসুম। কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর নজরুলের জন্ম, তাই তাঁর ডাকনাম রাখা হয় দুখু মিঞা।

নজরুলের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি নজরুলের পিতার মৃত্যুর পর কাজী পরিবার চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের চাপে নজরুলের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা হয়নি। তিনি গ্রামের মক্তবে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও মেধা ছিল। তাঁর জ্ঞান পিপাসা শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলভীর কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী দরবেশ ও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তাঁর আচার ব্যবহারে গভীর উদাসীনতা লক্ষ করে লোকে তাঁকে 'খ্যাপা' বলে ডাকত। অনেকের কাছে তাঁর আদরের নাম ছিল 'নজর আলি'।

দশ বৎসর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেই সংসারের চাপে এই মক্তবেই একবছর শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে নজরুলকে অর্থোপার্জনের জন্যে শিক্ষকতা ছাড়াও নিকটবর্তী গ্রামে মোল্লাগিরি করতে হত। কখনও তিনি হাজী পাহলোয়ানের মাজার-শরীফের খাদেম হন। মাঝে মধ্যেই তিনি মসজিদের এমামতিও করতেন।

পশ্চিমবঙ্গে 'লেটোনাচ' নামে এক কম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে, যাকে যাত্রাগান ও কবির লড়াইয়ের একটা মিশ্রিত সংস্করণ বলা চলে। বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না বলে নজরুল এইসব লেটোর দলে গান এবং নাটক রচনা করে অর্থোপার্জন করতেন। তাঁর বয়স যখন বারো কিংবা তেরো বছর মাত্র এসময়ে তিনি নিমসা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি 'লেটোনাচের' দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদবধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। শকুনিবধ, মেঘনাদবধ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, আকবর বাদসা, ইত্যাদি কয়েকটি পালাগানও রচনা করেন এই সময়ে।

স্কুলের ছক বাঁধা জীবনে কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল অস্থির হয়ে পড়লেন। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এই সময়ে তিনি শখের কবিগানের আসরে যোগ দিলেন। তিনি গান ও পালা লিখতেন এবং সেগুলোতে সুরারোপ করতেন। তিনি ঢোলক বাজিয়ে গানও গাইতেন। কবিগানের আসরে নজরুলের গানশুনে মুগ্ধ হয়ে এক গার্ডসাহেব তাঁর প্রসাদপুরের বাংলোতে তাঁকে বাবুর্চির কাজ দেন। গার্ডসাহেব ছিলেন মদ্যপ। কিছুদিনের মধ্যেই এক হাঙ্গামার সূত্র ধরে নজরুল গার্ডসাহেবের চাকুরি ছেড়ে দেন। এরপর নজরুল আসানসোলে চলে আসেন এবং আব্দুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে কাজ পেলেন। বেতন মাসে মাত্র পাঁচ টাকা। খুব ভোরে উঠে রুটির ময়দা মাখতে হয়, আর সমস্ত দিন ধরে রুটি তৈরি ও বিক্রি করতে হয়। রাতে যে সামান্য সময়ের জন্যে ছুটি পেতেন তা তিনি বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন। এই সময়ে নজরুল তাঁর যন্ত্রসংগীত নৈপুণ্যের জন্যে কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ নামে আসানসোলের এক দারোগার নজরে পড়েন। নজরুলের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে নিজগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অর্ন্তগত কাজীর সিমলাতে নিয়ে গিয়ে দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু

স্কুলের রুটিন-বাঁধা জীবন তাঁকে একেবারেই আকৃষ্ট করত না। ফলে ঐ বছরই বাৎসরিক পরীক্ষার ঠিক পরেই তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন।

কিছুকাল ঘোরাঘুরি করে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নিজের ইচ্ছাতেই আবার রানীগঞ্জে এসে ভর্তি হলেন শিয়ারশোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে। এই স্কুল থেকেই তিনি প্রি-টেস্ট দেন। তখন শহরে চলছে সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়। এই সময়ে স্বেচ্ছায় নজরুল ১৩২৪ সালে (১৯১৭) ৪৯নং বাঙালি পল্টনে (49th Bengalis Regiment) সৈনিক রূপে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষে পল্টন ভেঙে যাওয়ায় কবি ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে। শুরু হলো কবির নিরবচ্ছিন্ন কাব্য সাধনার কাল। নজরুলের শৈশব থেকে কৈশোরোত্তীর্ণ যৌবনের এ সময়ে দুটি ঘটনা কবি মানস গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। স্বল্প বয়সে বর্ধমানের 'লেটো' গানের দলে যোগ দিয়ে কবির মধ্যে কবিত্বশক্তি স্ফূরণের প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন হয়েছিল এবং এই প্রাণোচ্ছল সহজ কবিত্বশক্তি পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের বিচিত্র পটভূমিকায় বিদ্রোহের তপ্ত চাপা অগ্নিশিখায় জারিত হয়েছিল।

কবি কাজী নজরুল তাঁর বিচিত্র সাহিত্য জীবন আরম্ভ করেন গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি। কাব্যরচনার স্থায়ী ভিতের উপরই নজরুলের খ্যাতির সুউচ্চভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' রচনা করেন ১৯১৮ সালে। কবিতাটি ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ ফেরৎ কবি নজরুল ১৯২০ সালে বিদ্রোহী নামক যে কবিতাটি "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাই তাঁকে পৌঁছে দেয় কবি হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে। 'বিদ্রোহী' রচনার পর থেকে নজরুল আর পেছনে ফিরে তাকাননি। অসংখ্য রচনা ও সৃষ্টিসম্ভারে বাংলাসাহিত্যকে ক্রমাগত ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছিলেন।

একজন যথার্থ কবি তাঁর সমাজ, দেশ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে কাব্যসাধনার ভিত্তিভূমি রচনা করেন। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এ দেশের অন্যায় অত্যাচার বৈষম্য ও শোষণের মধ্যে কবি তাই সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। তিনি লেখনীর ভেতর দিয়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহের বীজ বুনে চলেন।

এ সময়ে কবির কাছ থেকে আমরা পাই অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙারগান, প্রলয়শিখা, সর্বহারা, সাম্যবাদ ফনিমনসা প্রভৃতি অগ্নিগর্ভ কাব্যগ্রন্থ। এ সময়ে রচিত অসংখ্য কবিতায় বিদ্রোহী কবি নজরুল অন্যায়-অত্যাচারপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত মূক মূঢ় হৃদয়ের ব্যথা বেদনাকে অগ্নি-বীণার জাদুকর সুষমায় ব্যক্ত করেছেন। সমাজ-রাষ্ট্রের অবিচার ও বৈষম্যের প্রতি বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ, ভাব-কল্পনা, চিত্ত ও চিন্তার স্বাধীনতা, বাণী প্রকাশের বিস্ময়কর স্বকীয় সৃজনশীলতা, অবারিত প্রাণশক্তি, উচ্ছল ও বাধাহীন উদ্দামতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সর্বোপরি একটি বিশাল উদার সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের সংবেদনশীল আনন্দ উচ্ছ্বাসের অব্যাহত গতিময়তা নজরুল কাব্যকে এক অসামান্য বিশিষ্টতা দান করেছে।

নজরুল মানুষের কবি ছিলেন। মানুষ ও মানবতাই তাঁর জীবনমন্ত্র ছিল। একদিকে মনুষ্যত্বের পূজারী কবি মানবতার বেদনাকেই ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত করেছেন। অপরদিকে জাতিভেদের ঊর্ধ্বে এই কবি বাঙালি জাতির পুঞ্জিত অপমান অব্যক্ত বেদনাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। এ জন্যেই তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে সেদিন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন।

মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কবি নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যান। এ সময় কবিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিনী পুরস্কার এবং ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করেন। এরপর কবিকে স্থায়ীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাসের জন্যে নিয়ে আসা হয় ঢাকায়। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৬ সালে কবি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। এই বছরেই আগস্ট মাসে কবি নজরুল ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তৎকালীন পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

কাব্য-পরিচিতি

অগ্নি-বীণা প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৯২২)। প্রকাশক : গ্রন্থকার, ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেন, কলিকাতা; প্রকাশকরূপে অনেক ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছেন শরৎচন্দ্র গুহ, আর্য পাবলিশিং হাউজ, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। পৃ. ২+৬৬; দাম এক টাকা। এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩-এর অগ্রহায়ণে এবং চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৫-এর শ্রাবণে। কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত অগ্নি-বীণার যে কটি

সংস্করণ প্রকাশিত হয় তারমধ্যে চতুর্থ সংস্করণই সর্বশেষ। এর প্রকাশক ছিলেন ডি এম লাইব্রেরির পক্ষে গোপাল দাস মজুমদার, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪+৫৮, মূল্য পাঁচ সিকা; মুদ্রণসংখ্যা ২২০০। নজরুল রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণে অগ্নি-বীণার চতুর্থ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'প্রবাসী' থেকে ১৩২৯ আষাঢ়ের 'নারায়ণ'-এ সংকলিত হয়েছিল।

বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'মোসলেম ভারত'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের সাপ্তাহিক 'বিজলী'-তে এবং ১৩২৮ মাঘের 'প্রবাসী'তে এই কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল।

'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র তারিখে ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক 'ধূমকেতু' পত্রিকায়।

'আগমনী' ১৩২৮ আশ্বিনের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে 'উপাসনা'-সম্পাদক শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "নজরুলের এক বিশিষ্ট দিকের কবিতা 'শাতিল আরব' যখন 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশ হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়ে হিন্দুর দেব-দেবী নিয়ে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'উপাসনা'য়—
>
> "এ কি রণ বাজা বাজে ঝনঝন।"
>
> —[কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১]

'আগমনী' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৯ই আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

'ধূমকেতু' শীর্ষক কবিতাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ (১৯২২, ১১ই আগস্ট) ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকায় (যার সারথি ও স্বত্বাধিকারী : কাজী নজরুল ইসলাম) প্রকাশিত হয়েছিল।

'কামাল পাশা' ১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে ভাদ্র তারিখের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় কবিতাটির কিছু অংশ সংকলিত হয়েছিল।

'আনোয়ার' ১৩২৮ কার্তিকের এবং 'রণভেরী' ১৩২৮ আশ্বিনের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'শাত্-ইল-আরব' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যার Frontispiece রূপে শোভিত হয়েছিল 'শাতিল্-আরবের চিত্র, তার নিচে Caption হিসেবে ছাপা হয়েছিল কবিতাটির প্রথম দুই চরণ।

> "সাতিল-আরব! সাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর
> শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।"

'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশকালে এবং প্রথম সংস্করণে 'সাত-ইল আরব' মুদ্রিত হয় 'দন্ত্য স' দিয়ে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যবহৃত হয়েছে তালব্য 'শ' 'শাত-ইল-আরব' বা 'শাতিল আরব'।

'খেয়া-পারের তরণী' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যায় গোড়ায় শোভিত হয়েছিল একখানি চিত্র। তার Caption এ ছাপা হয়েছিল :

> "বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়াভার,
> ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া-পার।"

'খেয়া-পারের তরণী' প্রসঙ্গে মুজাফফর আহমদ লিখেছেন :

> "কী কারণে জানিনা, আফজালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'মোসলেম ভারতে' ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মুহম্মদ আজম সাহেবের (খান বাহাদুর মুহম্মদ আজমের স্ত্রী) আঁকা একখানা নৌকার ছবি সঙ্গে নিয়ে আসেন। তার জন্যে ছবিখানা একদিন বিকালবেলা নজরুল ইসলামের নিকটে আফজালুল হক সাহেব

রেখে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, নজরুল ইসলাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দিবেন। কিন্তু নজরুল তা করলেন না। সে রাত্রিবেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে ছবিখানা অধ্যয়ন করলেন এবং তারপরে লিখলেন এই ছবির বিষয়ে তার বিখ্যাত কবিতা 'খেয়া–পারের তরণী।"

(কাজী নজরুল ইসলাম, স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ৫৩-৫৪।)

'কোরবানী' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে'। এ কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খান লিখেছেন :

"তারিকুল আলম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'কোরবানী'-কে বর্বরযুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধ পড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠল। নব্য তুর্কীরা তখন স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে জান্ কোরবান করছিল। সেই ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি লিখলেন :

"ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাহ শক্তির উদ্বোধন।"

'মোহর্‌রম' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যার গোড়ায় ছিল একটি ছবি, তার উপরে লেখা ছিল 'কারবালা-প্রান্তরে ইমাম হোসেনের সমাধি।' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ মোহররম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

উৎসর্গ পত্রটি ছাড়া মোট ১২টি কবিতা নিয়ে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়।

অগ্নি-বীণা : নামকরণ

নামকরণ একটি শিল্প। কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাবসম্ভার, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির উপলব্ধি-জাত চিন্তা-চেতনার যে প্রকাশ তাই এ কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে তাৎপর্য বয়ে এনেছে। তবে সংক্ষিপ্ত অথচ শ্রুতিমধুর নামকরনের মধ্যে কাব্যের অধিকাংশ কবিতার যদি প্রতিফলন থাকে– তাহলেই নামকরণ সার্থক হয়।

জীবনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে একথা সর্বজনস্বীকৃত। জীবনের ভিত্তি যখন নড়ে যায়, যখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আঘাতে জীবনের প্রাচীন অর্থ ও আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, জীবনাকাশে যখন বিচিত্র রঙ্গের রোমান্স ঢেউ তোলে তখন শিল্পেরও রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। জীবনের গতিবেগের সঙ্গে সাহিত্য তখন স্বচ্ছন্দে মিলিত হয়ে যায়। নজরুলের সাহিত্য কর্মে জীবনের এই গতিবেগের মিলিত রূপ দেখতে পাই। নজরুল যখন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন তখন একদিকে সমগ্র বাংলায় তথা ভারতবর্ষে এক বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বুদ্ধিজীবীদের উপর সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূক্ষেপ, জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে রক্তাক্ত রাজপথ, যুদ্ধের ফলে দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের সাজানো বাগানে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে। রুশ বিপ্লব এবং তৎকালীন ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের প্রভাবে পুরানো আমলের ধ্যান ধারণার বুনিয়াদ অবিশ্বাসের তীব্র আঘাত, মৃত্যু, দুঃখ, বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন। সংকটাপন্ন বুদ্ধিবাদ তখন পথ খুঁজছে নতুন দিকে, নতুন বাস্তব অবস্থাকে আত্মসাৎ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ফিরছিল। নজরুল এ অবস্থায় তার অগ্নি-বীণা হাতে নিয়ে বিদ্রোহী বেশে বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্র বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠ তাঁরই। জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে সার্থকভাবে যুক্ত করার প্রথম গৌরব বহুলাংশে তিনিই দাবি করতে পারেন। বাংলা কাব্যের বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাষ্যকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

নজরুলের আবির্ভাব তাই একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, তিনি যুগমানসের প্রতীক। সমকালীন যুগের মানস-সন্তান। নজরুলের বিদ্রোহের এমন একটা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য আছে যা সকল সুর, সকল কণ্ঠ অতিক্রম করে আমাদের কর্ণগোচর হয়েছে।

নজরুল মানুষের কবি ছিলেন। মানুষ ও মানবতাই তার জীবনমন্ত্র ছিল। এদেশের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অসহায়, অত্যাচারিত, শোষিত জনগণের মূঢ় হৃদয়ের কথা তিনি এ কাব্যে বিষয়বস্তু করেছেন। মুসলমান হয়েও তিনি নিজেকে ধর্মবর্ণ গোত্রের কোনো সংকীর্ণ গন্ডিতে বেঁধে রাখেননি। তিনি আজীবন হিন্দু মুসলমানের ক্ষুদ্র মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিরন্তন মানবাত্মার সন্ধান করেছেন– এ কাব্যে তিনি তারই জয়গান করেছেন। সমাজের ভ্রুকুটি এবং লাঞ্ছনা, সরকারি স্বৈরাচার

এবং কারাগারের বন্দী জীবনও নজরুলকে সত্য সাধনার পথ থেকে বিচলিত করতে পারেনি। প্রচলিত কোনো বিশেষ মতে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তিনি নিয়ম ও প্রথার গন্ডিকে ভেঙে সত্যাসত্য ও সুন্দরের আহ্বানে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মনুষ্যত্বের পূজারী কবি একদিকে এ কাব্যে মানবতার বেদনাকেই ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত করেছেন একদিকে, অপরদিকে জাতিভেদের উর্ধ্বে উঠে এ কবির বুকে বাঙালি জাতির পুঞ্জিত অপমান অব্যক্ত বেদনার ভারে ফেনিয়ে উঠেছে। এজন্যেই তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে সেদিন এই নবকাব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পেরেছেন।

১৩৩১ সালের (১৯২৪) শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে অগ্নি-বীণার নামকরণ সম্পর্কে বলা হয় :

"কবিতাগুচ্ছের অগ্নি-বীণা নাম সার্থক হয়েছে; কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে আগুনের ফুলকি ছুটিয়াছে, আর কোথাও বা সে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে।" তখনকার দিনের অন্যতম অভিজাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'তে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয় :

"গ্রন্থখানির সব কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়। যে যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ আজ আপনার ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে সেই যুগ-নির্মাতা রুদ্র-দেবতার আগমনধ্বনি গ্রন্থখানিতে শুনিতে পাওয়া যায়।"

মুসলমান সমাজের এক রক্ষণশীল অংশ অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে নজরুল ইসলাম ধর্মের শত্রু ও তৌহীদের মূল উৎপাটন করে পৌত্তলিকতা-প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অর্থাৎ বিদ্রোহী কবিতাটির জন্যে নজরুলের উপর অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষিত হয়। কিন্তু এইসব ব্যঙ্গবিদ্রুপ নজরুলের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। এ কাব্যে কবির বিদ্রোহে রাজনীতির ও সমাজনীতিক চেতনার স্বাক্ষর থাকলেও তা মূলত রোমান্টিক। প্রকৃত অর্থে একাব্য বিদ্রোহ বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা– এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ, সেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি উচ্চকিত প্রায় দিশেহারা। এ কারণেই এ কাব্যে অগ্নি থাকলেও সে অগ্নি-বীণায় পরিণত হয়েছে। ফলে নামকরণটি বিষয়ানুগ ও সার্থক হয়েছে।

নজরুলের জীবন গতানুগতিক পথ ধরে চলেনি। তাই তাঁর সৃষ্টিও বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছিল। তিনি বাঙলার কোমলকান্ত ও নিস্তেজম্লান জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করে তাকে বৃহত্তর মুক্ত জীবনের ডাক শুনিয়েছিলেন। জনজাগরণের এই মহৎকাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন বলেই মহাকালের কাছে অমরতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। অগ্নি-বীণা তাই নামকরন তাৎপর্যে সার্থক ও সফল।

অগ্নি-বীণা : মূলভাব

নজরুল ইসলামের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হয় ১৩২৯ (১৯২২) সালের কার্তিক মাসে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে "ভাঙা-বাঙলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু"। উৎসর্গপত্রের গানটি 'অগ্নিঋষি' নামে ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'উপাসনা'য় আত্মপ্রকাশ করে। গানটির দুটি স্তবকের প্রথমটি লক্ষণীয়—

"অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে।।
দহন-বনের গহন-চারী–
হায় ঋষি কোন্ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আন্‌লে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশী সে বুঝতে পারি না যে ॥"

উৎসর্গ গানটি ছাড়া মোট ১২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এ গ্রন্থ। কবিতাগুলো— প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিনী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণ-ভেরী, শাত্-ইল্-আরব, খেয়া–পারের তরণী, কোরবানী ও মোহর্‌রম।

এই গ্রন্থেরই শুধু নয়, নজরুলের সকল কবিতার মধ্যে ও অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সেসময়ে এত আলোড়ন তুলেছিল যে, এই বিশেষণটি এখনো নজরুলের নামের আগে একটি ভূষণের মতো শোভা বর্ধন করছে। মূলত এই কবিতাটি নজরুলের জীবনও কবি মানসের এক বিশেষ প্রতিনিধি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের অস্থির সময়– এ কাব্যের পটভূমি। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশে অন্যায় অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের মধ্যে কবি সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। দেশপ্রেম সমাজনীতি, রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য, আশা-উদ্দীপনা কাব্যরূপ পেয়েছে এ কাব্যের প্রতিটি কবিতায়। বিদ্রোহ ও ভাঙনের আহ্বানে এ কাব্য রচিত হলেও এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার বহুমুখী প্রতিভা। ধ্বংসের ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টির অনুপ্রেরণার সার্থক যুগ প্রতিনিধিত্ব করেছে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা। সমাজ, সংস্কার ও পৃষ্ঠা প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন তিনি। এই বিদ্রোহভাব শব্দ ছন্দ অলঙ্কারের যথার্থ ব্যবহারে আরো প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

এ কাব্যের হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়নের ক্ষেত্রে নজরুলের পারদর্শিতা প্রশংসনীয়। একই কবিতায় ভাবসৌন্দর্যের জন্য হিন্দু প্রতীক ও মুসলমান মহাপুরুষদের নাম গ্রহণে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি উভয় ঐতিহ্য থেকে অবলীলাক্রমে বিষয়, উপমা, রূপক এমনকি বাকভঙ্গি পর্যন্ত আহরণ করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় এর সার্থক রূপায়ণ লক্ষণীয়—

আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ইশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পানির উমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!

নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে সমমর্যাদা দিয়ে তার ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

এ কাব্যে পুরানের ব্যবহার প্রচুর। দ্রোহ প্রধান কবিতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক উল্লেখিত চারিত্র শিব, চণ্ডী। অপর দিকে, বেদুঈন, চেঙ্গিস, কামাল পাশা, আনোয়ার। এইসব পৌরোনিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে নজরুল তাঁর জাগরণমূলক কবিতায় ব্যবহার করেছেন অতুলনীয় শিল্প দক্ষতায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় অসংখ্য পৌরাণিক প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আমি ইন্দ্রানী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য!

কবির শব্দই তাঁর চৈতন্যের ধারক। অন্যভাবে বলা যায়, শব্দই কবিতা। কবির প্রয়োগ কৌশলে শব্দের অভিধানিক অর্থ ছাড়িয়ে যখন ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে- পাঠকের স্মৃতিকে, আবেগকে আলোড়িত কিংবা শিহরিত করে তখনই তা কবিতা। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ কাব্যে তিনি সংস্কারকে ভেঙেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত বহুদিনের অলস শব্দ সুষমার বিরুদ্ধে তিনি একটি প্রবল স্রোত ধারা সৃষ্টি করেছেন। বলা যায়, নতুন শব্দ ব্যবহার করে নজরুল রবীন্দ্র বলয় থেকে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছেন –যা একেবারেই নতুন এবং একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহীও। শাত্-ইল-আরব খেয়া–পারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম প্রভৃতি কবিতায় নজরুল যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন শব্দ ব্যবহারে — তা কোনোদিন বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হবে এমন চিন্তাও কোনো কবির মনে আসেনি তখন। যেমন, দিলির, চাঙ্গা, জান্নাত, খামোশ, গর্দানে, আজাদী নওশা, শমশের, নকিব ইত্যাদি।

ছন্দ ব্যবহারের তিনি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ কাব্যের সব কবিতা মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে নজরুল যে ছন্দটি ব্যবহার করে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছেন তা হলো মাত্রাবৃত্ত। বস্তুত, দ্রোহপ্রধান কবিতার ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন মাত্রাবৃত্তকে। বিদ্রোহী কবিতায় যেমন ব্যবহার করেছেন অতিপর্ব, তেমনি প্রস্বর বা বেনাকের প্রয়োগ লক্ষণীয় :

বল বীর—

বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।

দুই শব্দের মিলন ঘটিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে—

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই।

এছাড়া আনোয়ার, খেয়া–পারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম প্রভৃতি কবিতায় এ-রকম অন্তমিল লক্ষণীয়। ছন্দের আর একটি দুঃসাহসিক প্রয়োগ এই কাব্যের কোথাও কোথাও বলবান হয়ে উঠেছে। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে হঠাৎ কোনো পংক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে পাঁচ মাত্রা, এটি পতন নয় বরঞ্চ এরই ফলে ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তের যে ক্লান্তি তা কেটে গেছে। যেমন–

আমি অন্যায়/আমি উল্কা/আমি শনি =৬+৫+৪
আমি ধূমকেতু/জ্বালা, বিষধর/কালকনী =৬+৬+৪

ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতির সুনিপুণ ব্যবহারের ফলে কাজের গতি আরো বেগবান হয়েছে। বলা যায়, অগ্নি-বীণার প্রতিটি কবিতার পরতে পরতে শুকিয়ে আছে এক নিপুণ শিল্পীর মূর্তি।

অগ্নি-বীণা : আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

নজরুল ইসলাম তাঁর সহজাত কল্পনা প্রতিভা ও আবেগধর্ম কে অবলম্বন করে কবিতা রচনার ফলে তাঁর কবিতা সর্বত্র মননধর্মিতায় সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ হতে পারেনি সত্য কিন্তু এক দুর্লভ আন্তর-প্রেরণার উদ্ভাসনে সজীব হয়ে উঠেছে। তবে কল্পনা প্রতিভাকে অনুশীলন-পরিশীলনে পরিশুদ্ধ এবং মনোসমীক্ষণে মেধাবী করে তুলতে পারলে নজরুলের কবিতা হতে পারতো আরো বেশি হৃদয়-সংবেদী। তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নিপীড়িত ও বেদনার্ত মানুষের হাহাকারকে ভাষারূপচিত্রে বাঙময় করে তোলার জন্য নজরুলের যে তীব্র আবেগ– সে আবেগ অনুভূতিকে ইতিহাসচেতনা ও মননধর্মিতায় শুদ্ধ করে নেয়ার আবসর তাঁর ছিল না। কারণ তিনি শিল্পের চেয়েও জীবনকে বড় জেনেছিলেন।

কবিতার আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে নজরুলের নিজের মন্তব্য :

"আমি হিন্দু-মুসলমানের পরিপূর্ণ মিলনে বিশ্বাসী; তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি না; বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।"

শব্দই সর্বময় চৈতন্যের ধারক। তার প্রাত্যহিক অথবা আভিধানিক অর্থ হয়তো একটি বিশেষ বস্তু বা উপলব্ধির সংলগ্ন; কিন্তু কবির প্রয়োগ কৌশলে অভিধানের সীমা ছাড়িয়ে তা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনা ধর্মী। পাঠকের স্মৃতিকে, আবেগকে আলোড়িত কিংবা শিহরিত করবে। তাকে বর্তমান থেকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করবে। নজরুল ইসলামের কবিতার ভাবগত ও ছন্দগত সৌন্দর্যের প্রথম পরিচয় মেলে বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে। যদিও 'বিদ্রোহী'র অনেক চরণে দুর্বল শব্দ বিন্যাস ও অর্থহীন চাতুর্যের পরিচয় মেলে তবু ছন্দের নতুনত্ব ও কোথাও কোথাও অন্তরাবেগের সুতীব্র স্ফূর্তির জন্য এই কবিতাটিই নজরুল প্রতিভার পথনির্দেশক হয়ে আছে।

বল বীর—

বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।

বল বীর—

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!"

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কাব্যাংশটুকু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায় — বীর, শির, হিমাদ্রির : বিধাত্রীর ও জয়শ্রীর প্রত্যেক শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' অথবা 'ঈ' স্বর বিলম্বিত লয়ের হলেও শব্দান্তের 'অ' স্বর প্রায় অনুচ্চারিত থাকায় প্রত্যেক শব্দে একটি ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ব্যঞ্জন বর্ণের সংযুক্তস্বরে বিচ্ছিন্নভাবে stress আপতিত হওয়ায় বিভিন্ন পদ-মধ্যে গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতায় উপমা-রূপক-চিত্রকল্প সৃষ্টি কবির সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক। রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক কবিতার বক্তব্য ও ভাবকে কেন্দ্র করেই কবিতার রূপ নির্মিত হয়ে যাকে। বৃহত্তর মানবজীবন এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাকে অঙ্গীকার করে সার্থক চিত্ররূপ রচিত হয়েছে 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতায়—

"এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্‌গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।"

শব্দচিত্র রচনায় ও রূপক সৃষ্টিতে নজরুলের কবি-শক্তি ও কল্পনা প্রতিভার পরিচয় দীপ্ত।

সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতার চেয়ে বেদনা-বিষাদময় কবিতাতেই নজরুল শব্দচিত্র রূপকল্প ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'খেয়া–পারের তরণী' শীর্ষক কবিতার অংশ বিশেষ লক্ষণীয় :

"নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ।
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!
তমসাবৃতা ঘোর কিয়ামত রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী!"

নজরুলের যেসব কবিতায় আবেগের সততা ও কল্পনার সুদূর বিস্তার লক্ষণীয়, সেসব কবিতায় উপমা উৎপ্রেক্ষা-রূপকল্পে এসেছে এক অস্থির গতিশীল প্রবাহ।

শব্দ তৎসম, দেশি কিংবা আরবি-ফারসি যাই হোকনা কেন তা বক্তব্যের অনিবার্য প্রয়োজনে যদি এসে থাকে তাহলেই তার সার্থকতা। নজরুলের অনেক কবিতায় আবেগের প্রশ্রয়ে শিল্পের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি যেমন বিপন্ন হয়েছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুযায়ী সঠিক শব্দ প্রয়োগে কখনো তা বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে। আবেগের আন্তরিকতার কারণে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পরম সম্পর্কে পরিণত হয়েছে—

"আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্!
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।"

ভাব-ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কার স্বন্যাসে এ কাব্য হয়ে উঠেছে সার্থক। প্রথমত, নজরুল তাঁর আবেগের প্রতি সৎ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি বিনয়বশত শিল্প-চর্যার প্রয়োজনকে অস্বীকার করলেও এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। এই আবেগ যখন শিল্পচর্যায় সংহত হয়েছে, তখন তা সার্থক কবিতার দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যুগের চাহিদাকে তিনি আপন হৃদয়াবেগে ধারণ করেছিলেন বলেই কেবল কবি ভাষার স্বাতন্ত্র্যে নজরুল রবীন্দ্র-আবহাওয়ার ভেতরে থেকেও আলাদা, বিশিষ্ট।

অগ্নি-বীণা : বিদ্রোহী চেতনা

জীবনের জন্যেই শিল্প। তাই জীবনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে একথা সর্বজন স্বীকৃত। জীবনের মৌল ভিত্তি যখন টলে যায়, যখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আঘাতে জীবনের প্রাচীন অর্থ ও আদর্শ, মূল্যবোধ-সব যখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তখন শিল্প-সাহিত্যেও তার রূপান্তর ঘটতে বাধ্য, জীবনের গতিবেগের সঙ্গে সাহিত্য স্বচ্ছন্দে মিলে যায় তখন। নজরুলের সাহিত্য-কর্মে জীবনের এই গতিবেগের মিলিত রূপ দেখতে পাই।

নজরুল যখন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন, তখন একদিকে সমগ্র বাংলার তথা ভারতবর্ষে এক বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বুদ্ধিজীবীদের উপর সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূক্ষেপ, জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে রক্তাক্ত রাজপথ, যুদ্ধের ফলে দুনিয়া জোড়া অর্থনৈতিক সংকট; বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের সাজানো বাগানে তীব্রতর ভাঙন দেখা দিয়েছে। রুশ বিপ্লব এবং তৎকালীন ইউরোপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের প্রভাবে পুরোনো আমলের ধ্যান ধারণার বুনিয়াদ অবিশ্বাসের তীব্র আঘাত, মৃত্যু দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন। সংকটাপন্ন বুদ্ধিবাদ তখন খুঁজছে নতুন আলোর দিশা, নতুন বাস্তব অবস্থাকে আত্মসাৎ করার জন্যে হয়ে উঠেছে ব্যাকুল। অধিকাংশ কবি তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভার কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করে কাব্য সরস্বতীর আরাধনা করছিলেন। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নজরুল তাঁর 'অগ্নি-বীণা' হাতে নিয়ে বিদ্রোহী বেশে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আর্বিভূত হলেন। রবীন্দ্র বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠ তাঁরই। জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে সার্থকভাবে যুক্ত করার প্রথম গৌরব বহুলাংশে তিনিই দাবি করতে পারেন। বাংলা কাব্যের বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাষ্যকারদের মধ্যেও তিনি অন্যতম।

'অগ্নি-বীণা', 'বিশের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'জিঞ্জির', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়শিখা' — কাব্যগ্রন্থের মূল সুর প্রায় এক। কবির বিদ্রোহীরূপ এগুলোর মধ্যে প্রায় পরিস্ফুট। দেশপ্রেম, সমাজনীতি 'রাজনীতি' ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি কাব্যরূপ পেয়েছে।

'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হলে এ কাব্যের 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ তাঁকে চিনেছিল। যৌবনধর্মী কবিমানসের অস্থির, অধৈর্য, দিশেহারা মন, ব্যক্তি ও আদর্শবাদ শাসনের নামে অবাধ কুশাসনের প্রতিবাদ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিক্ষুব্ধ ভাষা ও বিদ্রোহের বাণী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর জবরদস্ত সংহত সংগ্রাম ও সংগঠনের উদাত্ত আহ্বান কবিতাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

নজরুলের আবির্ভাবকালে সমকালীন সাহিত্যে বিদ্রোহের সুর ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠছিলো। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অসি চালানোর মতো দুঃসাহস কেউ অর্জন করেনি। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন নজরুল। তিনি শুধু সরব বিদ্রোহ ঘোষণায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অসি ধারণই করেননি, স্বয়ং বিধাতা পুরুষের বুকে পদাঘাত হানার দুর্জয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন।

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' —এখানেই নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। 'বিদ্রোহী' কবিতার মতো 'ধূমকেতুতে'ও কবির বিদ্রোহের রুদ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতায় তাঁর বিদ্রোহ কেবল শাসক এবং শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধেই ঘোষিত হয়নি, বিভিন্ন দিক থেকে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য যেখানে গোজামিল, জোড়া-তালি, অনাচার-অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ করেছেন, বন্ধনহীন নজরুলের সরব কণ্ঠ সেখানেই গর্জন করে উঠেছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে যখন খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে আলী ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত, তখন নজরুল এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে লিখলেন 'কামালপাশা' ও 'শাত্-ইল্-আরব'। এই কবিতাগুলো রচনার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের শাসনে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতনরূপ ফুটিয়ে তোলা। 'মোহর্‌রম', 'কোরবানী', 'রণ-ভেরী' কবিতার প্রত্যেকটি ছত্রে মুসলিম সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার ও সেই সঙ্গে জেগে ওঠার জন্যে মৃত্যুভয়হীন ম্লান ধ্বনি ফুটে বেরিয়েছে। একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি অপরদিকে হিন্দু-সমাজের দুরত্ব ঘোচাবার জন্যে 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী' ইত্যাদি কবিতা লিখেছেন।

"রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।"

(রক্তাম্বরধারিনী মা)

"রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশ দিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসিকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!"

(আগমনী)

নজরুলের বিদ্রোহ চেতনার আরেকটি দিক হচ্ছে তাঁর অপরিসীম মনবতাবোধ। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। উদার মানবিকতারই পূজারী বিদ্রোহী নজরুল। তাঁর বিদ্রোহ এবং মানবিকতা তাই একসূত্রে গ্রথিত। অনেকে মনে করেন নজরুলের এ বিদ্রোহ উদ্দেশ্যবিহীন বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিদ্রোহের কোনো চিরন্তন ফলশ্রুতি নেই— আছে চিৎকার। কিন্তু তাঁর বহুল আলোচিত 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁর বিদ্রোহের উদ্দেশ্য নির্দেশিত হয়েছে :

"আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

(বিদ্রোহী)

উদ্দেশ্যবিহীন বিদ্রোহ যে, পাগলামীর নামান্তর একথা নজরুল ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর বিদ্রোহ কেবল ভাঙার জন্যই নয়– সে ভাষার পেছনে রয়েছে নতুন গড়ার সংগ্রাম। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা একটি চিঠিতে নজরুল নিজেই বলেছেন– "নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙ্গি— শুধু ভাঙার জন্যেই ভাঙার গান আমার নয়।" ভাঙার পেছনে গড়ার মহান সংকল্প রয়েছে বলেই বিদ্রোহ। তাই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় নজরুল বলেন—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? –প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন–জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!"

জরাজীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে ধুলায় গড়িয়ে দিয়ে যৌবনাদীপ্ত নতুন তাজমহল রচার সংকল্পেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। ইংরেজ শাসনে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে চেহারা দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিবাদে বিদ্রোহী না হয়ে উপায় ছিল না। কেবল ইংরেজ কেন– নিখিল বিশ্বের বুর্জোয়া-সমাজ মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে যে ঘৃণ্যরূপে দাঁড় করায় তার প্রতিবাদেই নজরুলের বিদ্রোহ।

মানুষকে মানুষের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে– নজরুলের বিদ্রোহবাদের মূলে এই একটি মাত্র শক্তি কাজ করেছে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য সর্বত্রই তিনি নিখিল বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর মানবিকতার আদর্শ প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। যেখানে তা পাননি, সেখানেই তিনি হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী। সকল অন্যায় অবিচারী শক্তির বিরুদ্ধেই তাঁর শির উন্নত।

অগ্নি-বীণা কাব্যে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য চেতনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী, হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিবেসে বাংলাকাব্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭৬) আবির্ভাব। উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণকে নজরুল আত্মস্থ করেছিলেন সচেতনভাবে। জনসম্পৃক্ততা তাঁর কবি চৈতন্যে এনেছিল এক নতুন মাত্রা। প্রেমে ব্যর্থতায় যেমন তেমনি বিদ্রোহ প্রকাশের

জন্যেও তিনি সচেতনভাবে ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় উভয় ঐতিহ্য সাদরে বরণ করেছেন। নজরুল ইসলাম যেহেতু জন্মসূত্রে ভারতীয় তাই ভারতীয় উত্তরাধিকারকে তিনি আপন উত্তরাধিকার বলে জেনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে যেহেতু ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি ছিলেন পশ্চিম এশীয় তথা ইসলামের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তাই আপন কবিসত্তায় তিনি উভয় ঐতিহ্যকেই সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন।

নজরুল ইসলাম যে মাটিতে দাঁড়িয়ে কাব্যচর্চা করেছেন হাজার বছর আগে সেখানে অনার্য সংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল। বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির বিরোধ-মিলনের ফলে এদেশে জন্মলাভ করেছিলো এক নতুন প্রাণবন্ত সংস্কৃতি। জন্মসূত্রে নজরুল তাই রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ এবং ধর্মসূত্রে কোরআন, হাদিস, তফসির, নবি-রসুল ও খলিফাদের কীর্তি-কাহিনী ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। ফলে তাঁর কাব্যে এই উভয়দিকের উত্তরাধিকারিত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

'অগ্নি-বীণা' কাব্যে নজরুলের ঐতিহ্য চেতনার সচেতন প্রকাশ লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। এই কাব্যের প্রধান কবিতা 'বিদ্রোহী'। কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য ও জীবনবোধের প্রসঙ্গে খোদার আসন, আরশ ছেদিয়া, ইস্রাফিলের সিঙ্গা, বোর্‌রাক, জিব্রাইল, হাবিয়া-দোযখ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নটরাজ ধূর্জটি, হোমশিখা, জমদগ্নি, ইন্দ্রানী, কৃষ্ণ-কণ্ঠ, ব্যোমকেশ, ইশান, পিনাক-পানি, ধর্মরাজের দণ্ড, প্রনব-নাদ, দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য, উচ্চৈঃশ্রবা, বাসুকি, শ্যাম, বিষ্ণু, চণ্ডী, পরশুরাম, বলরাম, ভৃগু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুলের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বলা যায়, ঐতিহ্য থেকে আর এক ঐতিহ্যে নজরুলের পদচারণার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ বির্নিমাণের জন্যে শক্তির সন্ধান করা। নজরুল ইসলাম উল্লেখিত চরিত্র এবং প্রসঙ্গসমূহ ব্যবহার করেছেন শুধু ইতিহাস এবং পুরাণ উল্লেখিত চরিত্র হিসেবে নয়, তাঁর সচেতন Historical sense এর ফলে ঐতিহ্যভিত্তিক চরিত্রসমূহ এবং শব্দ-অনুষঙ্গ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য চেতনার এটাই অন্যতম লক্ষণ যে, তা ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে। এ কাব্যের ১২টি কবিতার মধ্যে সাতটি ইসলামী ঐতিহ্য, তিনটি বিশুদ্ধ হিন্দু ঐতিহ্য এবং দুটি কবিতা হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের মিশ্রণে রচিত।

নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যের ব্যবহার করেছেন। একদিকে ঔপনিবেশিক সমাজকে ভাঙার উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে সেই ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে নটরাজ শিবের চিত্রকল্পে উপস্থাপিত হয়েছে ঐতিহ্য চেতনার দ্বৈত উদ্দেশ্য। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় দেখা যায় :

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ॥

'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী' প্রভৃতি কবিতায় নজরুল দুর্গার বিভিন্ন রূপের চিত্র এঁকেছেন শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে। 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতায় চণ্ডীমাতাকে আহ্বান করে বলা হয়েছে :

নিদ্রিত শিরে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্ধতা, দৈন্যদশা, ক্লীবত্ব, আত্মবিস্তৃতি দূর করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে কবি 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতার চণ্ডীমাতাকে তার শ্বেত শতদল পরিহার করে রক্তাম্বর ধারণ করার জন্যে আহবান করেছেন :

শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিনী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা

কারা অবরুদ্ধ বর্তমান সময়ে চণ্ডীর শ্বেতবসন পরিহিতা কুলবধূর রূপকল্পনা অবান্তর। তাই সচেতন নজরুল ইসলামের হাতে চণ্ডী একটি যুগোপযোগী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'আগমনী' কবিতায় শিবদুর্গার ছবির নেপথ্যে কবির মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে :

রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশ দিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর।

কবির বিদ্রোহী ও বিপ্লবী চেতনার প্রকাশে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ কতটা সার্থক ও যথোপযুক্ত হয়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বিদ্রোহী' কবিতা। হিন্দু ঐতিহ্যের রূপায়ণ লক্ষণীয় :

আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
... ...
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রীয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!

মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়ণে নজরুল ইসলামের চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বিষয়বস্তু নির্বাচনে। ইসলামের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঘটনাবলী যেমন– 'মোহর্‌রম', 'কোরবানী' বা কারবালা তাঁর কাব্যের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

অন্যায়-অত্যাচার ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে 'ধূমকেতু' কবিতায় :

সাত– সাতশ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে!
মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!

মুসলিম ঐতিহ্যের স্বীকৃতি বিজড়িত কবিতাগুলোতে কবি মুসলমান সমাজজীবনের বর্তমান দৈন্যদশা, ভীরুতা ও শঙ্কা দূর করার অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।

'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', রণ-ভেরী কবিতায় তুরস্ককে এবং শাত্-ইল্-আরব কবিতায় ইরাককে অবলম্বন করে স্বদেশের পরাধীনতার, বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন কবি। 'কামাল পাশা' কবিতায় কবি বলেন :

পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।

'আনোয়ার' কবিতায় নজরুল তরুণ কবির কণ্ঠে দুনিয়ার মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারের শৌর্য-বীর্যের গরিমা ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম সমাজের দুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে তাদের মধ্যে প্রাণের উদ্দীপনা আনবার জন্য তিনি আনোয়ারের উদ্দেশ্যে বলেন :

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার।

ইসলামি ঐতিহ্য, বীরত্বের প্রতীক হযরত আলী-দুধারী তরবারি, জুলফিকার যা বারবার নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রূপে। জুলফিকার তাঁর হায়দারি হাঁক 'হেথা আজো হজরত আলীর' এ চরণে ইসলামের অতীত ও বর্তমানকে একই সূত্রে গাঁথা। অতীতের বর্তমানতা কিংবা ঐতিহ্যের জাগরণ এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'মোহর্‌রম' কবিতাটি এ কাব্যের একটি আবেগদৃপ্ত, ধর্মীয়-সঙ্গীত হিসেবে রচিত। কবি এ কবিতায় শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন :

ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা, —
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির, —

'আগমনী' কবিতায় লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধার তালে তালে' বলতেই বোঝা যায়, এ যুদ্ধের পতাকা লাল, কিন্তু এ যুদ্ধের হাঁক হর হর হর হুঙ্কার ধ্বনি। 'খেয়া–পারের তরণী' ঐতিহ্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি। তবে এখানেও এসেছে প্রলয়ের হুঙ্কার ধ্বনি।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুল ইসলামের হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য স্মরণ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি সচেতনভাবে আরবি-ফারসি শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ। এই শব্দ ব্যবহার তার ঐতিহ্য-চেতনাকেই প্রকাশ করেছে। 'খেয়া–পারের তরণী' কবিতায় শোনা যায় উদাত্ত আহবান—

আবুবকর উস্‌মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান লা– শরীক আল্লাহ্।

একই ভাবে আরেকটি দৃষ্টান্ত :

আমি ছিন্নমস্ত চণ্ডী আমি রণদা সর্বনাশী
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি,

নজরুলের কবিতায় ঐতিহ্যের এরূপ সচেতন স্বচ্ছন্দ শব্দের মিশ্রণ একটি বিশেষ লক্ষণ। বস্তুত, সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ হতে মুসলিম সম্প্রীতি নজরুল মানসের একটি অংশ। নজরুল অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে।

পরিশেষে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন জনজীবন সম্পৃক্ত কবি। তাই তার ঐতিহ্যবোধও ছিল জীবন সম্পৃক্ত। অতীত ঐতিহ্যকে তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি বরং ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করেছেন নতুনভাবে নতুন জীবন ভাবনায়। বহুবিস্তারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি একই সঙ্গে ভারতীয় এবং ইসলামি ঐতিহ্য ব্যবহারে পরম সিদ্ধি অর্জন করেছেন। এভাবেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি নির্মাণ করেছেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

প্রলয়োল্লাস

ভূমিকা

'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় কবি নজরুল শিবের নটরাজ সত্তার আলোকে ধ্বংস ও সৃষ্টির কথা বলেছেন। শিব একই সঙ্গে ধ্বংস এবং সৃষ্টির যুগল স্মৃতিবহ। নজরুল প্রচলিত সমাজকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়তে চান। এ কবিতায় কবির ধ্বংস এবং সৃষ্টির দ্বৈতচেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- কবিতায় ঐতিহ্যের ব্যবহার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কবির ঔপনিবেশিক সমাজ ভেঙে সেই ভাঙনের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে-
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর-
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে!
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

মাভৈঃ, মাভৈঃ, জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে।
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে!
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঐ সে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেব্‌তা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে!
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? –প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন— জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে'—
ভেঙে আবার গ'ড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কেতন– পতাকা। **নৃত্য-পাগল**– নটরাজ শিব। শিব তাণ্ডব রাগে নৃত্য করে পৃথিবী ধ্বংস করেছিল, সে-কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। **চণ্ড**– পৌরাণিক অসুর। চণ্ডকে হত্যা করেছে বলে দুর্গার আরেক নাম চণ্ডী। **কৃপাণ**– তরবারি, খড়্গ। **মাভৈঃ**– ভয় নেই। **দিগম্বর**– শিব।

সারসংক্ষেপ :

প্রলয়োল্লাস [প্রথম প্রকাশ-প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (১৯২২)] এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে রুশবিপ্লবের সাফল্যে নজরুলের কবিচিত্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। কবি এ কবিতায় পুরাতনের ধ্বংস ঘটিয়ে নতুনকে আহ্বান জানান। তিনি দেশবাসীকে ডাক দেন নতুনকে বরণ করতে।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।"

প্রলয়োল্লাসে-মত্ত অনাগত সুদিন যেন সিংহ প্রতীক ব্রিটিশ রাজশক্তির বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসছে।

"আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশায় নৃত্য-পাগল
সিন্ধু পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল-আগল"

ধ্বংস দেখে ভীত হবার কারণ নেই। প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির পথ তৈরি হয়। অসুন্দরকে উচ্ছেদ করতেই নবীনের আবির্ভাব। চিরসুন্দর নতুনই ধ্বংসের বুকে নতুন সৃষ্টি করতে জানে।

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? -প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন, জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দিগম্বরের জটায় কে লুটিয়ে পড়ে?

ক. চাঁদের কর
খ. মহাসিন্ধু
গ. মহাকাল
ঘ. ধূমকেতু

২. 'প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির পথ তৈরি হয়
খ. জীবনে অসুন্দরকে উচ্ছেদ করতে হবে
গ. কবিচিত্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত
ঘ. ধ্বংস দেখে ভীত হতে নেই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে চরণের –

ক. বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।
খ. ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।
গ. তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
ঘ. আলো তার ভরবে এবার ঘর।

৪. উদ্দীপক ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে –

i. ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ
ii. তারুণ্য দুর্বার ও দুঃসহ
iii. আত্মত্যাগেই মানবতার উজ্জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় অসুন্দরকে সুন্দর করতে কে আসছে?

ক. বজ্র-শিখা
খ. নবীন
গ. ধ্বংস
ঘ. দেবতা

৬. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় 'সিংহদ্বারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ব্রিটিশ রাজশক্তি
খ. বিশ্বমাতা
গ. দিগম্বরের জটা
ঘ. দ্বাদশ রবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে চলে মেরু অভিযানে
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্ব পানে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোন চরণের –

ক. আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
খ. বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে।
গ. দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
ঘ. বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে।

৮. উদ্দীপক ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. নতুনের আবাহন
ii. অন্ধকারের হাতছানি
iii . পরাজয়ের কষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

সমাজ পরিবর্তনশীল। এটি ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। কালের পরিক্রমায় জীর্ণ সমাজে পুরাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে সবসময়ই নতুন মূল্যবোধ এবং সুন্দরের সন্ধান করে। সেই সুন্দর আর সত্যকে আহ্বান জানাতে কখনো কখনো প্রলয়ের পথকেও বেছে নিতে হয়। ধ্বংসের ভেতর তখন জেগে উঠে নতুন সৃষ্টি। এভাবে সকল অসুন্দরকে ছিন্ন করে সুন্দরের জয়মাল্য বরণীয় হয়ে ওঠে।

ক. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় শিব কিসের প্রতীক?

খ. কবি কীভাবে নতুন সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন?

গ. উদ্দীপকটি 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "নতুন সম্ভাবনা ও সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপক ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার উপজীব্য।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় শিব একদিকে ধ্বংস এবং অন্যদিকে নবসৃষ্টির প্রতীক।

খ.

কবি কাজী নজরুল ইসলাম পুরাতন ঘুণে ধরা জীর্ণ সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের সমকালে ভারতবর্ষে শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন-অন্যায়-অনিয়ম জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল। তাই তিনি প্রচলিত সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছেন। তাঁর এ ভাঙনের খেলায় সবাই ভীত হয়। কিন্তু কবি সকলকে অভয় দিয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীতে যখন কোনো প্রলয় আসে তখন ভয়ের সৃষ্টি হলেও প্রলয় শেষে শান্ত সুন্দর নতুন পৃথিবী জন্ম লাভ করে। কেননা পুরাতনের ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত থাকে নতুন সৃষ্টির বীজ।

গ.

পুরাতনের ধ্বংস ঘটিয়ে নতুনকে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে উদ্দীপকটি 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পুরাতনের ধ্বংসের মধ্যে নতুনের সম্ভাবনা ও সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়। তাই ধ্বংস দেখে ভীত হবার কারণ নেই। প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির পথ তৈরি হয়। অসুন্দরকে ধ্বংস করতেই পৃথিবীতে নতুনের আবির্ভাব ঘটে। চিরসুন্দর নতুনই ধ্বংসের বুকে নতুন সৃষ্টির মন্ত্র আনে।

'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় কবি পুরাতনের ধ্বংস ঘটিয়ে নতুনকে আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯২১ সালের রুশ বিপ্লবের সাফল্য কবিচিত্তে এ প্রভাব ফেলেছে। তিনি দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন নতুনকে বরণ করতে। কবির মতে ধ্বংস দেখে ভীত হবার কারণ নেই। কেননা ধ্বংসের ভেতর দিয়েই জেগে ওঠে নতুন সৃষ্টি। তিনি দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন নতুনকে বরণ করতে। চির সুন্দর নতুনই ধ্বংসের বুকে নতুন সৃষ্টির মন্ত্র আনতে পারে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে সমাজ পরিবর্তনশীল। এটি ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়। মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সব সময় নতুন সৃষ্টিকে স্বাগত জানায়। তাই বলা যায়, 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় নতুনকে আহ্বান জানানোর বিষয়টি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

'নতুন সম্ভাবনা ও সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপক ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার উপজীব্য।' –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম যুগ-মানসের প্রতীক। তিনি যুগের মানস সন্তান। তাঁর প্রত্যয় হচ্ছে প্রচলিত সমাজ ও পুরাতন রীতির ধ্বংস এবং নতুন সৃষ্টির আবাহন। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি নতুন এক মানবিক আদর্শের প্রকাশ দেখতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, কালের পরিক্রমায় পুরাতন ও জীর্ণ সমাজের অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে পুনরায় নতুন মূল্যবোধ এবং সুন্দরের সন্ধান করে। এই নতুন সৃষ্টি আর সত্যকে খুঁজে পেতে অনেক সময় প্রলয়ের পথকেও বেছে নিতে হয়। কিন্তু এক সময় সকল অসুন্দরকে ছিন্ন করে নতুন সম্ভাবনা ও সৃষ্টি আর সুন্দরের জয়মাল্য বরণীয় হয়ে উঠে। কবিতায়ও বলা হয়ছে, কবি নতুনের পূজারি। সুন্দর সৃজনে প্রতিবন্ধক রূপ অসুর নিধনের জন্যই কবি হাতে নিয়েছেন

তরবারি। পুরাতনেরা জরাজীর্ণকে আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে শ্বাস নিতে অভ্যস্ত, কিন্তু প্রাণবান কবি সুন্দর পৃথিবী নির্মাণে তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন।

কবিতায় কবি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতেছেন। তিনি আঘাতে আঘাতে উদ্দীপনার উৎসারণে ভাঙনের খেলা খেলতে খেলতে নতুন সৃষ্টিশীল সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন। উদ্দীপকেও তেমনি ধ্বংসের ভেতর নতুন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপক এবং 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার উপজীব্য হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।

ক. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় কবির মতে চিরসুন্দর কে?
খ. 'প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার চেতনা উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. "প্রলয়োল্লাস' কবিতায় নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন উদ্দীপকেও অনুরণিত হয়েছে।" –স্বীকার করেন কি? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. ক ৮. ক

বিদ্রোহী

ভূমিকা

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় পুরাণ ও ইতিহাসের আধার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নজরুল এখানে প্রবল বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করেছেন। নজরুল বিদ্রোহ করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, শৃঙ্খল পরা আমিত্বের বিরুদ্ধে। এই কবিতা রচনার জন্য নজরুল 'বিদ্রোহী' কবির আখ্যা পেয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়ণে নজরুলের সাফল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্রোহী ও বিপ্লবী চেতনা প্রকাশে নজরুলের হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য ব্যবহারের সাফল্য বিচার করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শর নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।
আমি- ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!

আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল বীর-
চির- উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল ;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর ;
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,

আমি পিনাক্-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ-খোলা হাসি-উল্লাস, –আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!—
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!

আমি আর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরির তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!! —

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;

আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

হিমাদ্রি– হিমালয় পর্বত। **শির নেহারি**– শির দেখে, মাথা দর্শন করে। **নটরাজ**– শিব। **পৃথ্বীর**– পথিবীর। **ধূর্জটি**– শিব। **বিদ্রোহী-সুত**– বিদ্রোহীর পুত্র। **হাম্বীর**– এক প্রকার রাগ। **চপলা**– বিদ্যুৎ, লক্ষ্মী দেবী। **জমদগ্নি**– পৌরাণিক ঋষি। তপস্যার বলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। **কৃষ্ণ-কণ্ঠ**– শিব। সমুদ্রমন্থনের সময় বিষ ধারণ করেছিল বলে শিবের গলা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে শিবকে কৃষ্ণ-কণ্ঠ বলা হয়। **ব্যোমকেশ**– শিব। **গঙ্গোত্রী**– গঙ্গা নদী। **কুর্নিশ**– সালাম। **পিণাক-পাণি**– শিব। **প্রভঞ্জন**– ঝড়ের দেবতা। **বারিধি**– সমুদ্র। **বোররাক্**– বেহেশতের ঘোড়া। **উচ্চৈঃশ্রবা**– স্বর্গের ঘোড়া। **আগ্নেয়াদ্রি**– আগ্নেয়গিরি। **পরশুরাম**– পৌরাণিক ঋষি। তিনি পিতৃ-আদেশে মাকে হত্যা করেছিলেন। ভৃগু– ব্রহ্মার মানসপুত্র।

সারসংক্ষেপ :

'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালের কার্তিকে ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে। কবিতাটি রচনার উৎস সম্পর্কে মুজাফফর আহ্মদ বলেছেন, মোহিত লাল মজুমদার তাঁর 'আমি' শীর্ষক একটি কথিকা নজরুলকে পড়ে শোনান। তিনি দাবী করেন, 'আমি'র ভাবসম্পদ ধার করেই নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন।

'আমি' কথিকার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে :
"আমি ভীষণ-অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বক্ষাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভান্ধ পিতৃরোষ।"
নজরুল সাহিত্য সমালোচক ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেন—

" 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে 'আমি' কথিকার মিল রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দিক দিয়ে। 'আমি' কথিকাটি পড়ে বোঝা যায়– 'আমি'র মধ্যে দার্শনিক মনোভাব প্রবল; কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অনেকখানি সামাজিক ও রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, 'একটি রচনার প্রেরণা থেকে অন্য একটি উঁচুদরের রচনা জন্মগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে 'আমি' যদি 'বিদ্রোহী'কে কিঞ্চিৎ প্রেরণা যুগিয়ে থাকে তাহলেও 'বিদ্রোহী' বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জীবনবোধে 'বিদ্রোহী' 'আমি'র চেয়ে উৎকৃষ্টতর রচনা।"

এই কবিতাটির জন্যে নজরুলের ওপর অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষিত হয়। কিন্তু এসব ব্যঙ্গবিদ্রূপ নজরুলের পক্ষে শাপেবর হয়ে দাঁড়ায়। কবিতাটি বহুল আলোচিত হওয়ায় অভূতপূর্ব প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করে। নজরুলের পরিচিতি এবং খ্যাতি দুই-ই বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এই কবিতাটির জন্যে।

বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচক 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, নজরুলের বিদ্রোহে রাজনীতিক ও সমাজনীতিক চেতনার স্বাক্ষর থাকলেও তা মূলত রোমান্টিক। রোমান্টিসিজমের অনেকটা স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু এই কবিতার রোমান্টিক বিদ্রোহ অনেকক্ষেত্রে ঐ চিত্তের সীমা লংঘন করেছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোনো বিদ্রোহের বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা– এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ, সেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি উচ্চকিত– প্রায় দিশেহারা।

প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে বলা যায়, এই কবিতার ভাষা শুধু অর্থপূর্ণ ভাষা না হয়ে যেন কতগুলি ভাবের অভিব্যক্তি ব্যঞ্জক ইঙ্গিতমাত্র

হয়ে উঠেছে। সুসংবদ্ধ অর্থ সর্বত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও কবির উচ্ছ্বাস হৃদয় দিয়ে তা অনুভবগম্য। এইভাবে বিচার করলে বলা যায়, 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিম্বলিক (symbolic) কবিতা। নজরুলের এই সার্থক সিম্বলিকতার মূলে কাজ করেছে তাঁর দুর্দান্ত পৌরুষ, উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ এবং বীর্যবন্ত চির উন্নত শির অহমিকা (egotism)। এই অহমিকার উদগ্রতম প্রকাশের সার্থক রূপায়ণ 'বিদ্রোহী' কবিতা।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন-শোষণ, অন্যায়-অবিচার আর বৈষম্যের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন থেকেছে। একজন যথার্থ কবি তাঁর সমাজ, দেশ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে যে রস গ্রহণ করেন– তাই তাঁর কাব্য ফসলের প্রাণশক্তি। সমাজ সচেতন কবি তাই সমাজ, রাষ্ট্রের অবিচার ও বৈষম্যের প্রতি তার বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত নন। পৃথিবীজুড়ে যে অন্যায়, অবিচার আর বৈষম্য– তার বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ, প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে, যতদিন না তাঁর মূল উৎপাটিত হবে।

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমি রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এই সূত্রে আমেরিকার জাতীয় কবি হুইটম্যানের One's-self I sing নামে একটি অনবদ্য কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটি রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বোধিত মানবচিত্তের ঘোষণা। Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হয়েছে, সেখানেই তিনি Whitman-কে অনুসরণ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্রোহী কবিতায় কাকে 'মুক্ত জীবনানন্দ' বলা হয়েছে?

ক. কবি
খ. নটরাজ
গ. ইস্রাফিল
ঘ. জমদগ্নি

২. 'ভগবান- বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' উক্তিটিতে 'ভগবান' যে প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে–

ক. সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচার
খ. খেয়ালী মনের কল্পনা
গ. কবির রোমান্টিসিজম
ঘ. কাব্য– ফসলের প্রাণশক্তি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তোমাকে ভেবেছি কতদিন,
কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে
কত গোলা ফাটার মুহূর্তে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন চরণটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন।
খ. আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা।
গ. আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।
ঘ. মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

৪. উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ–

i. সংশয়
ii. যন্ত্রণা
iii. হৃদয় ব্যাকুলতা

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

ক. মোসলেম ভারত　　খ. ছায়ানট
গ. ধূমকেতু　　ঘ. ভারত সমাচার

৬. 'আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' চরণ দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. আত্ম- অহমিকা　　খ. উচ্চকিত প্রতিবাদ
গ. সামাজিক অবিচার　　ঘ. সাম্যের বাণী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকূল সূর্যোদয়
রক্তশোভিত মুখমণ্ডলে চমকাক বরাভয়।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে

ক. বিদ্রোহী　　খ. কামাল পাশা
গ. আনোয়ার　　ঘ. আগমনী

৮. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ভাবে
ii. ভাষায়
iii. ছন্দে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। জন্মেই তিনি দেখেছেন জাতির হাতে-পায়ে কঠিন শৃঙ্খল এবং চারপাশের সমাজ নানা অন্যায়, অবিচার ও অবক্ষয়ের অতল তলে ডুবে আছে। কবি চেয়েছিলেন পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে ঘুমন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে। তাই তিনি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এভাবে সমকালীন যুগ, তার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় সুকান্তকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র কবিসত্তা। তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার মুক্তিমন্ত্র।

ক. কবি কার শিঙ্গার মহা হুঙ্কার?
খ. 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।' –কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দাম হৃদয়াবেগ ও অহমিকার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে বিদ্রোহী' কবিতায়।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার।

খ.

যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি আকাশে-বাতাসে আর ধ্বনিত হবে না কবি সেদিন শান্ত হবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা 'বিদ্রোহী' কবিতার পটভূমি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন, শোষণ, অবিচার আর বৈষম্যের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন থেকেছে। সমাজ-সচেতন কবি সমাজ, রাষ্ট্রের অবিচার ও বৈষম্যের প্রতি তার বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। কবির ইচ্ছা পৃথিবী জুড়ে যে অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে। প্রতিবাদ সরব থাকবে যতদিন না তার মূল উৎপাটিত হবে।

গ.

উদ্দীপকটি বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশের দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিচিত্তে বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঘুমন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত করবার জন্য নিজে যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তেমনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবি জরাজীর্ণ পুরাতন সমাজ ও রীতিনীতি ভেঙ্গে নতুন দেশ ও জাতি গড়তে তাঁর কাব্যে ভাঙনের খেলা খেলেছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সমকালীন যুগ, তার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় সুকান্তর কবিসত্তা গড়ে তুলেছে। তাঁর কবিতায় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন, শোষণ, অন্যায়, অবিচার আর বৈষম্যের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন থেকেছে। সমাজ সচেতন কবি এ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কবিতায় কবির এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে যতদিন না তার মূল উৎপাটিত হয়। তাই বলা যায় বিদ্রোহ ও উচ্চকিত প্রতিবাদের দিক থেকে কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

'বিদ্রোহী' কবিতায় উদ্দাম হৃদয়াবেগ ও অহমিকার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। ধূমকেতুর মতোই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন দাসত্বের বিরুদ্ধে, শোষণে-শোষণে জর্জরিত জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর এই বিদ্রোহ সমাজের সর্বস্তরে ধেয়ে চলেছে। সর্বোপরি কবির বিদ্রোহ চেতনায় প্রবল অহমিকা প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সমকালীন যুগ, তার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় সুকান্তর স্বতন্ত্র কবি-বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিল। তাঁর কবিতা উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তির লড়াইয়ে আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাও রাজনৈতিক চেতনায় এক অভূতপূর্ব আত্মবোধের জন্ম দিয়েছে। যেখানে সারা পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা পদদলিত, অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের গ্লানি– এর মধ্যে কবি সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। কবিতায় অন্যায়ের বিপরীতে ন্যায়কে, মিথ্যার পরিবর্তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবির দুর্মর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে সুকান্তর কবি-ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে অতিপ্রাকৃত দুর্দান্ত পৌরুষ ও উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ। এর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গিতে যুক্ত হয়েছে চির উন্নত শির অহমিকা। অতএব, বলা যায়, 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির উদ্দাম হৃদয়াবেগ ও অহমিকার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,

আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক;
উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
ভীরুরা থাক্
কোটি করাঘাত পৌঁছাক দ্বারে;
মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি;

ক. কবি ফিং দিয়ে কয়টি দোল দেন?
খ. 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি খুঁজে বের করুন।
ঘ. "উদ্দীপক এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি একই চেতনার অনুসারী।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ক

রক্তাম্বরধারিণী মা

ভূমিকা

'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় দুর্গার চণ্ডীরূপের কথা বলা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে চণ্ড নামক অসুরকে হত্যা করার জন্য দুর্গার ভয়ংকর রূপ কবি এ কবিতায় স্মরণ করেছেন এবং এ দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে দুর্গার ঐ বিনাশী শক্তির উদ্বোধন কল্পনা করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- দুর্গার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নজরুলের হাতে দেবী চণ্ডীর যুগোপযোগী উপস্থাপনা দেখাতে পারবেন।
- শক্তি সঞ্চয়কারী দুর্গার স্বরূপ উপলব্ধি করে তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।
নিঃশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু–
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি'।

হাস খল খল, দাও করতালি,
বল হর হর শঙ্কর!
আজ হ'তে মা গো অসহায় সম

ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

রক্তাম্বর– রক্ত বা লাল রঙের শাড়ি। **শ্বেত বসন**– সাদা শাড়ি। **খড়্গ**– তরবারি, অস্ত্র। **এলোকেশ**– খোলা চুলে। **কাঁকন**– চুড়ি, কঙ্কন। **শঙ্কর**– শিব। **মেখলা**– কটিভূষণ, কোমরে পরার অলঙ্কার। **জালিম**– অত্যাচারী। **দনুজ**– দনুজাত, অসুর।

সারসংক্ষেপ :

কবিতাটি প্রথমে কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'ধূমকেতু' অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৯ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জাগরণীমূলক কবিতা হিসেবে কবিতাটি রচিত। দেশে লাগাতার আন্দোলন চলাকালে শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এটি একটি জাগরণীমূলক কবিতা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা, দৈন্য, ক্লীবত্ব আত্মবিস্মৃতি দূর করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কবি 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতায় চণ্ডী মাতাকে আহ্বান করে বলেছেন–

নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,

কারা অবরুদ্ধ বর্তমান সময়ে চণ্ডীর শ্বেতবসন পরিহিতা কুলবধূর রূপকল্পনা অবান্তর। তাই সচেতন কাজী নজরুল ইসলামের হাতে চণ্ডী একটি যুগোপযোগী চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

কবিতাটি তৎকালীন সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই কবিতায় কবি হিন্দুসমাজের অসামঞ্জস্য, অকল্যাণ, দৈন্য, বৈচিত্র্যহীনতা জড়ত্ব ইত্যাদি দূর করার জন্যে মহাশক্তিকে চণ্ডীরূপে আহ্বান করেছেন। তিনি মনে করেন চণ্ডী রূপিণী বিপ্লবই ধ্বংসের বুকে নতুন সৃষ্টি জাগাতে সমর্থ হবে :

"দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ

রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।"

হিন্দুপুরাণে মহাশক্তির যে চণ্ডীরূপ আছে কবি এখানে বিপ্লবকে সেইরূপে কল্পনা করেছেন। ভাব, ভাষা, ছন্দ অলঙ্কার ব্যবহারে কবিতাটি সার্থক হয়েছে। জরাজীর্ণ সমাজকে ভেঙে দিয়ে নতুন সৃষ্টির যে উন্মাদনা, ধ্বংসের বুকেই যে নিহিত আছে নতুন সৃষ্টির নবপূর্ণিমা, কবি যেন সেই পরম সত্যটিকেই আবিষ্কার করেছেন এ কবিতায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মা কীভাবে ভোলার ভাঙ-নেশা ভাঙবেন?

ক. লাথি মেরে
খ. চাবুক মেরে
গ. করতালি দিয়ে
ঘ. চিতা জ্বালিয়ে

২. মহাশক্তির চণ্ডীরূপকে কবি সমকালের কোন রূপে প্রকাশ করেছেন?

ক. বিপ্লব
খ. তুফান
গ. ক্রন্দন
ঘ. ধ্বংস

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দেবী দুর্গা এক সময় বিশেষ উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করেন। আবার দক্ষযজ্ঞ নাশ করার সময় তিনি উগ্রচণ্ডা রূপ ধারণ করে কোটি যোগিনীসহ শিবের সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে যে চরণটি সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ।
খ. সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
গ. হাস খল খল, দাও করতালি,
বল হর হর শঙ্কর।
ঘ. দেখি ঐ সাজে মা কেমন
সাজে তরবারি ঝনন্-ঝন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

৪. উদ্দীপক ও 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার চেতনা–

i. সমধর্মী
ii. বিপরীতধর্মী
iii. সহমর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. অসুরকে নাশ করতে মা কি হবেন?

ক. বিষ্ণু
খ. ভীম
গ. শিব
ঘ. শঙ্কর

৬. 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় উচ্চকিত হয়েছে–

ক. জাতির জাগরণ
খ. সমাজের কল্যাণ
গ. সৃষ্টির ধ্বংস
ঘ. শতদলের বিনাশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ব্রিটিশ আমলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুকুন্দ দাস অনেকগুলো আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে কোন কোন কবিতায় তিনি চিত্রকল্পের মাধ্যমে পুরাণ ও লৌকিক দেবীর রুদ্ররূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কবির চেতনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্লীবত্ব দূর করতে মহাশক্তির 'চণ্ডরূপ' বিপ্লবী শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

৭. উদ্দীপকে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার কোন দেবী সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. মহামায়া
খ. দুর্গা
গ. পার্বতী
ঘ. চণ্ডী

৮. উদ্দীপক ও 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় দেবী চণ্ডীর যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে–

i. রুদ্র
ii. শান্ত
iii. ভক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই চাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।

ক. 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতাটি কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
খ. ' তোমার খড়্গ হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।
গ. 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকে মায়ের অপত্য স্নেহ প্রকাশ পেলেও 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় রুদ্র রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতাটি ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ.

পরাধীন দেশে শ্বেতবসনা মমতাময়ী দেবীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন অসুর নিধনকারী দেবী চণ্ডীর।

হিন্দু পুরাণ মতে দেবী চণ্ডী আপন খড়্গের আঘাতে অসুরকে নিধন করে তার রক্ত পান করেন যাতে রক্তবীজ মাটিতে পড়ে পুনরায় অসুরটি জন্মগ্রহণ করতে না পারে। বাঙালি কবি নজরুল ইসলামও কল্পনা করেছেন পরাধীন ভারতবর্ষে মহাশক্তি রূপ দেবী চণ্ডী গৌরবময় সক্রিয়তা প্রদর্শন করবেন। এতে শোষকরূপ ব্রিটিশ রাজশক্তি পুনরায় বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারবে না। কবির আরও প্রত্যাশা দেবীর খড়্গে ব্রিটিশ শোষক শক্তির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠবে।

গ.

উদ্দীপকের সঙ্গে 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

সন্তানের প্রতি মা সাধারণত স্নেহপরায়ণ হয়ে থাকেন। পুরাণ মতে দেবী চণ্ডীর যেমন স্নেহশীল মাতৃরূপ রয়েছে তেমনি তিনি রক্তাম্বর রূপ ধারণ করে অসুরকে নিধন করতে পারেন। চণ্ডী আপন খড়্গের আঘাতে অসুর নিধন করে তার রক্ত পান করেন যাতে রক্তবীজ মাটিতে পড়ে আবার অসুরের জন্ম না হয়।

উদ্দীপকে মা সন্তানের শিয়রে বসে ছেলের অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন। মায়ের ছেলে একদিন তাকে না বলে দূর বনে গিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ ছেলে বাড়ি ফিরে না এলে মা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় দেখা যায়, মা রক্তাম্বর পরে আছেন। তার দেহ ভঙ্গিমায় একটি রুদ্ররূপ রয়েছে। মায়ের জলাকেশের দুলুনী কাল-বৈশাখীর ভীম তুফানের মতো। তার চরণের আঘাতে আহত বিশ্ব যেন রক্তের বানে ভেসে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মায়ের সঙ্গে রক্তাম্বরধারিণী মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে মায়ের অপত্য স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় তার রুদ্র রূপ ফুটে উঠেছে।

মাতৃরূপের বাইরেও দেবী চণ্ডীর একটি প্রলয়ংকরী রূপ রয়েছে। এই রূপে দেবী অসুরকে হনন করে থাকেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামও পরাধীন ভারতবর্ষে দেবীর এই সক্রিয়তা কামনা করেছেন। কবি চেয়েছেন ব্রিটিশ রূপ অসুরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুনর্বার দেবীর খড়্গ যেন ব্রিটিশ শোষকদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

উদ্দীপকে মায়ের স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। সাঁঝের বেলায় তার ছেলে ঘরে ফিরে না এলে তিনি আশঙ্কিত হয়েছেন। বাড়ি ফেরার পথে ছেলের গান শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের হাতে চণ্ডী একটি যুগোপযোগী চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির মতে অবরুদ্ধ বর্তমান সময়ে চণ্ডীর শ্বেতবসন পরিহিতা কূলবধূর রূপ কল্পনা অবান্তর। হিন্দু পুরাণে মহাশক্তির যে চণ্ডী রূপ আছে কবি এখানে সেই চণ্ডীরূপ মহাশক্তিকে বন্দনা করেছেন। কবি মনে করেছেন চণ্ডীরূপ বিপ্লবই ধ্বংসের বুকে নতুন সৃষ্টি জাগাতে সক্ষম হবে।

উদ্দীপকে মায়ের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা, দৈন্য, ক্লীবত্ব ও আত্মবিস্মৃতি দূর করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চণ্ডী মাতাকে আহ্বান করা হয়েছে। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে জাগরণীমূলক কবিতা হিসাবেও পরিচিত। তাই উদ্দীপকে মায়ের অপত্য স্নেহ প্রকাশ পেলেও 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় চণ্ডীর রুদ্র রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রতীক রায় আধুনিক যুগের শব্দকুশলী এবং পরাবাস্তববাদী চেতনার একজন কবি। পরাবাস্তববাদী কবি হলেও তিনি তাঁর কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু পুরাণের ব্যবহার করেছেন। পুরাণে বর্ণিত মহাশক্তির যে একটি চণ্ডীরূপ আছে তা তাঁর কবিতায় বিপ্লবী শক্তি হিসেবে কল্পিত হয়েছে। বিপ্লবই ধ্বংসের বুকে নতুনের সৃষ্টি করে। কবি হিন্দু সমাজের অসামঞ্জস্য, অকল্যাণ, দৈন্যদশা, বৈচিত্র্যহীনতা ও জড়ত্ব দূর করার জন্য দেবী চণ্ডীর আবাহন চেয়েছেন।

ক. কবি মাকে কোন্ রূপ দেখাতে অনুরোধ করেছেন?

খ. দেবী চণ্ডীকে ধ্বংসের জন্য আহ্বান করা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের চেতনা 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. " 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার আলোড়ন উদ্দীপককেও স্পর্শ করেছে।" – মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ঘ ৮. ক

আগমনী

ভূমিকা

'আগমনী' কবিতায় দুর্গার ধ্বংস এবং সৃষ্টি– এই যুগল রূপ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার পরিণতিতে শরৎকালে দুর্গার আগমনী রূপ কবি তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'আগমনী' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- হিন্দু সমাজের অন্ধতা ও ক্লীবতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিবদুর্গার ছবির নেপথ্যে কবির বিপ্লবী চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একি রণ-বাজা রাজে ঘন ঘন—
ঝন রণরণ রণ ঝনঝন!
সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি'
ওঠে চোটে চোটে,
ছোটে লোটে ফোটে!
বহ্নি-ফিণিকি চমকি' চমকি'
ঢাল-তলোয়ারে ছনছন!
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ!

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই পালে পালে,
ধরা কাঁপে দাপে।
জাঁকে মহাকাল কাঁপে থর থর!
রণে কড়কড় কাড়া-খাঁড়া-ঘাত,
শির পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর-ধ্বনি ঘরঘর!
গুরু গরগর বোলে ভেরী তুরী,
"হর হর হর হর"
করি' চিৎকার ছোটে সুরাসুর-সেনা হন-হন!
ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি'

হু-হু হু-হু হু-হু শন-শন।
ছোটে সুরাসুর-সেনা হন-হন!

তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ খল-খল-খল,
নাচে রণ-রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে,
ধ্বকধ্বক জ্বলে জ্বল জ্বল!
বুকে মুখে-চোখে রোষ-হুতাশন!
রোস্ কথা শোন্!

ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,
ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে,
যম-বরুণ কি কল-কল্লোলে চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে! চরণ-ভঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল!

ওকি বিজয়-ধ্বনি সিন্ধু গরজে কল-কল্ কল কল-কল্!
ওঠে কোলাহল
কূট হলাহল
ছোটে মন্থনে পুনঃ রক্ত-উদধি
ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল্!
টলে নির্বিকার সে বিধাতৃরো গো
সিংহ-আসন টলমল!
কার আকাশ-জোড়া ও' আনত নয়ানে
করুণা-অশ্রু ছলছল!

বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্,
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রথম, ববম্ বম্ বম্!
লাল লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার,
রণ ডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহ্নির বান রে!
কোটি বীর প্রাণ
ক্ষণে নির্বাণ
তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্‌গম্!
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত-পিশাচেরও
শিরদাঁড়া করে চন্-চন্!
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,

নিশীথনী ভয়ে থম্‌থম্‌!
বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঝর ঝম্‌ ঝম্‌!

ঐ অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য!
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায় ;
ত্রস্ত বিধাতা,
মস্ত পাগল পিনাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়!
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়!
চিতার উপরে চিতা সারি সারি,
চারি পাশে তারি
ডাকে কুক্কুর গৃধিনী শৃগাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!!

রণ-রাঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্‌ মহারণ,
দশ দিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা এ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শ্বাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!

'নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,
চাই মানব!'—
বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার!

ওঠ রে ওঠ্‌,
ছোট্‌ রে ছোট্‌!
শান্ত মন,
ক্ষান্ত রণ! —

খোল্‌ তোরণ,
চল্‌ বরণ
করবো মা'য়;
ডরবো কা'য়?
ধর্‌বো পা'য় কার সে আর
বিশ্ব–মা'ই পার্শ্বে যার?

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া

ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া!
এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী অমলা ঐ,
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা
এলো বীণা-পাণি অমলা ঐ।
এসেছে গণেশ,
এসেছে মহেশ,
বাস্ রে বাস্!
জোর উছাস্!!
এলো সুন্দর সুর-সেনাপতি,
সব মুখ এ যে চেনা চেনা অতি!
বাস্ রে বাস জোর উছাস!!

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক।
ভুলে যাও শোক–চোখে জল ব'ক
শান্তির— আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন-গীত চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত চলুক!

আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!
স্বা-গতম্
স্বা-গতম্!!
মা-তরম্!
মা-তরম্!
ঐ ঐ ঐ বিশ্বকণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে— "বন্দে মাতরম!!"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

সুরাসুর– সুর এবং অসুর। **ব্যোম**– আকাশ। **আয়ত**– বড়, বিশাল। **রুদ্র**– শিব। **প্রহরণ**– অস্ত্র। **মহামাতা**– দুর্গা। **আশিন**– আশ্বিন। **বন্দে-মাতরম**– মাতাকে বন্দনা করি।

সারসংক্ষেপ :

'আগমনী' ১৩২৮ সালে আশ্বিন সংখ্যা 'উপাসনা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'আগমনী' কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর রুদ্ররূপ বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। কবি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের সৃষ্টি কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি চারিদিকে অসুন্দর, অকল্যাণ ও অন্ধতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধকে দেখতে পেয়েছেন। পিনাক-পাণির ধ্বংসলীলার বর্ণনার পর নজরুল জগৎমাতার রণরঙ্গিনী মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই রণ হচ্ছে দানবশক্তির বিরুদ্ধে মানবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।

রণরঙ্গিনী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে–
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!"

এরপর কবির সম্মুখে উদয় হয়েছে কমলা, বীণাপাণি, গণেশ, মহেশ ও সুর-সেনাপতিকে। যুদ্ধের পর শান্তির পরিবেশে কবি মায়ের আগমন কামনা করেছেন। তাঁর এই আবাহন বাংলাদেশে শরৎকালীন দুর্গাপূজাকে মনে করিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তা মাতৃভূমির বন্দনাতে মুখর হয়ে উঠেছে। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার বিন্যাসে কবিতাটি সার্থক হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ত্রিকাল' কীভাবে দুলছে?

ক. প্রলয় দোলায় খ. পায়ে পিষে
গ. খল- কল্লোলে ঘ. আনত নয়নে

২. 'আগমনী' কবিতায় দেব-দেবীর যে রূপটি প্রকাশিত হয়েছে–

ক. বাৎসল্য খ. শান্ত
গ. রুদ্র ঘ. নির্বিকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে হিন্দু দেবদেবীর রুদ্ররূপ প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষ করে মঙ্গল কাব্যের কবিগণ দেবদেবীর সংহার রূপের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সৃষ্টিশীল জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। তারা পার্থিব জগতের সকল অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেগুলো ধ্বংস করতে চেয়েছেন।

৩. উদ্দীপকের চেতনা 'আগমনী' কবিতার যে চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. যম-বরুণ কি খল-কল্লোলে চলে উতরোলে ধ্বংসে মাতিয়া। খ. জাঁকে মহাকাল কাঁপে থর থর।
গ. লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে। ঘ. ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক।

৪. উদ্দীপক ও 'আগমনী' কবিতায় প্রকাশিত প্রত্যাশা–

i. নতুন জীবনের সৃষ্টি
ii. দানব শক্তির জয়
iii. সিন্ধুর বিজয়-ধ্বনি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. জগৎমাতার পদতলে কে লুটিয়ে পড়ে?

ক. পিনাক খ. ডম্বরু
গ. মহিষাসুর ঘ. বীণা-পাণি

৬. জগৎমাতার 'মহারণ' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. দুর্গা পূজা খ. কালী পূজা
গ. মনসা পূজা গ. চণ্ডী পূজা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল ভৈরব তাথৈ থৈ।

৭. উদ্দীপকের নটনাথ 'আগমনী' কবিতায় কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. কার্তিক　　খ. জগৎমাতা
গ. গণেশ　　ঘ. মহিষাসুর

৮. উদ্দীপক ও 'আগমনী' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ধ্বংসের বারতায়
ii. জ্বালাময় রোষে
iii. রক্ত-সুরায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

চণ্ডীর বর্ণনা অনুযায়ী, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় দেবী মায়ের নাম হয়েছে দুর্গা। মা দুর্গা ব্রহ্মশক্তি, স্বরূপিণী, বিভাসিতা মাতৃশক্তি। তিনি জগজ্জননীরূপে সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি সব প্রাণিতে চেতনা, বুদ্ধি, শক্তি, শান্তি, শ্রদ্ধা, দয়া ইত্যাদি নানা রূপে বিরাজিতা। সব ধরনের অকল্যাণের হাত থেকে তিনি আমাদের অর্থাৎ তার সন্তানদের রক্ষা করেন। শাস্ত্রমতে দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামে শরণাগত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামী দেবতাদের তিনি সব সময় বরাভয় দান করেন। মা দুর্গাদেবী কল্যাণময়ী বরাভয়দায়িনী হিসেবে জগতের কল্যাণ সাধন করেন।

ক. কবি কাকে বন্দনা করতে বলেছেন?
খ. 'আগমনী' কবিতায় হিন্দু দেব-দেবীর কোন রূপটি কেন প্রয়োগ করা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'আগমনী' কবিতার সঙ্গে কেন সঙ্গতিপূর্ণ? –বিশ্লেষণ করুন।
ঘ."আগমনী' কবিতা ও উদ্দীপকে জগৎমাতার বাঙালি রূপ প্রকাশ পেয়েছে।" –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

কবি বিশ্বকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে মা'কে বন্দনা করতে বলেছেন।

খ.

'আগমনী' কবিতায় হিন্দু দেব-দেবীর রুদ্ররূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্ধতা, দৈন্য, ক্লীবত্ব ও আত্মবিস্মৃতি দূর করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে ডাক দিয়েছেন 'আগমনী' কবিতায়। কবি চারিদিকে অসুন্দর, অকল্যাণ ও অন্ধতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি ধ্বংসের মধ্যে নূতন জীবনের সৃষ্টি কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাই কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর রুদ্ররূপ বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে কবি কবিতায় জগৎমাতার রণরঙ্গিণী রূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। এই রণ হচ্ছে দানবশক্তির বিরুদ্ধে মানবত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

গ.

অসুরকে নিধনের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে 'আগমনী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

অসুরকে নিধন করতে দেবতাদের তপস্যায় দেবী দুর্গার সৃষ্টি। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবী যখন অসুন্দর, অকল্যাণ ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তখন এ ধরাধামে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। দেবী দুর্গা অসুর নিধন করে অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের সৃষ্টি করেন। তিনি দানব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিরসুন্দরের আবাহন করেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় দেবী মায়ের নাম হয়েছে দুর্গা। তিনি সব ধরনের অকল্যাণের হাত থেকে তার সন্তানদের রক্ষা করেন। ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তিনি দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামে শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামী দেবতাদের সব সময় বরাভয় দান করেন। অন্যদিকে 'আগমনী' কবিতায়ও মা দুর্গার সংহার লীলার বর্ণনা রয়েছে। মা দুর্গার সংহার লীলার অন্তরালে কবি নতুন জীবনের সৃষ্টি কামনায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন। কবির স্বপ্ন হচ্ছে দানব শক্তির বিরুদ্ধে একদিন মানবতার জয় হবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'আগমনী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

'আগমনী' কবিতা ও উদ্দীপকে জগৎমাতার বঙ্গীয় কল্যাণময় রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

দেবী দুর্গা ব্রহ্মশক্তি, তিনি বিভাসিতা মাতৃশক্তি। আদ্যাশক্তি দুর্গা জগৎ জননীরূপে পথিবীর সবখানে বিরাজিত থাকেন। দানব শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এই মমতাময়ী মাতৃমূর্তিই আবার রণরঙ্গিনী রূপ ধারণ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে দেবী দুর্গা শান্তি, শ্রদ্ধা, দয়া ইত্যাদি নানা রূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেন। সব ধরনের অকল্যাণ হতে তিনি পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করেন। তিনি মাতৃময়ী, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সংহারী চণ্ডীরূপ ধারণ করেন। মা দুর্গা কল্যাণময়ী বরাভয়দায়িনী হিসেবে জগতে মানুষকে প্রশান্তি দান করেন। 'আগমনী' কবিতায়ও দেবী দুর্গার মাতৃরূপটি প্রকাশিত হয়েছে। কবি যুদ্ধের পর শান্তির পরিবেশে মায়ের আবাহন করেছেন। তাঁর এই আবাহন বাঙালি সমাজে শরৎকালীন দুর্গাপূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপক ও 'আগমনী' কবিতা উভয়টিতে দেবী দুর্গার কল্যাণময়ী মাতৃরূপটির পরিস্ফুটন ঘটেছে। জগৎমাতা দেবী দূর্গা কল্যাণময়ী বরাভয়দায়িনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। একটি বিশেষ পরিবেশে তার রুদ্ররূপ প্রকাশ পেলেও তিনি শেষ পর্যন্ত শান্তির পরশ বুলিয়েছেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, 'আগমনী' কবিতায় বর্ণিত জগৎমাতার কল্যাণময়ী রূপটি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।...
উর- 'পরে হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা।
নিয়া রক্তপানের কি অগস্ত্য -তৃষ্ণা
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইক দিশা।

ক. দুর্গা কয়বার মহিষাসুরকে বধ করেন?

খ. কবিতায় দূর্গাপূজার অন্তরালে মাতৃভূমির বন্দনার স্বরূপ আলোচনা করুন।

গ. 'আগমনী' কবিতা ও উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "আগমনী' ও উদ্দীপকে অপশক্তিকে ধ্বংসের প্রয়াসে জগৎমাতার চণ্ডীমূর্তি চিত্রিত হয়েছে।" –বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. ক

ধূমকেতু

ভূমিকা

'ধূমকেতু' কবিতায় কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রোহ করার জন্য কবি আপন শক্তিতে জাগ্রত হতে চেয়েছেন। তাঁর সেই ব্যক্তিক জাগরণের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে বক্ষ্যমাণ কবিতায়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুনের মিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন রূপটি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
সাত— সাত শ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে!
মম ধূম-কুণ্ডলী ক'রেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ,
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার–
আর মর্ত্যে সাহারা-গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ!

আমি সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,
আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান অভিমুন্যে।
শোঁও শন-নন-নন-শন-নন-নন শাঁই, শাঁই,
ঘুর্ পাক্ খাই, ধাই পাঁই পাঁই,
মম পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি
করি উল্কা-অশনি-বৃষ্টি,—
আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি!
আমি অপঘাত দুর্দৈব রে আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি!

আমি আপনার বিষ-জ্বালা মদ পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুঁদ হয়ে আমি চ'লেছি ধাইয়া ভাইয়া!
শুনি মম বিষাক্ত 'রিরিরিরি' -নাদ
শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব-ঘোরার প্রণব-নিনাদ!
মম ধূর্জটি-শিখ করাল-পুচ্ছে
দশ অবতারে বেঁধে ঝ্যাটা ক'রে ঘুরাই উচ্চে, ঘুরাই-
আমি অগ্নি-কেতন উড়াই!–

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়ায়েছিল রে হাত,
মম অগ্নি-দাহনে জ্ব'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে', ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি!
আমি জানি জানি ঐ ভূয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা' ও!
তাই বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও।
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থুথু দি',
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল্-আগুনের কাতুকুতু দি'।
মম তরীয় লোকের তির্যক-গতি তূর্য-গাজন বাজায়!
মম বিষ-নিশ্বাসে মারিভয় হানে অরাজক যত রাজায়!

কচি শিশু-রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল,
আর বদ্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাস, মোন্ছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি,
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!
পেলে বাহান্ন-শও জাহান্নামেও আধা চুমুকে সে শুষে যাই!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু—
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
আমি শি শি শি প্রলয় শিশ্ দিয়ে ঘুরি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি,
আমি ত্রিভুবন তার পোড়ায়ে মারিয়া আমিই করিব মুখাগ্নি!
তাই আমি ঘোর তিক্ত সুখে রে, এক পাক ঘু'রে বোঁও ক'রে ফের দু'পাক নি',
কৃতঘ্নী আমি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি!
পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর,
শোন্ রে মর, শোন্ অমর!-
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালিয়াছি বুকে চিতা।

ছোট্ শন্ শন্ শন্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই!
ছোট্ পাঁই পাঁই!
তুই অভিশাপ তুই শয়তান তোর অনন্তকাল পরমাই!
ওরে ভয় নাই তোর মার নাই!!
তুই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু,
তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা, ন'স্ অমরার ঘুম-সেতু,
তুই ভৈরব-ভয় ধূমকেতু!

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ঐ ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি,
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি!
ক্ষ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক, দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে, শুনে' হাসি আমি আর নাচি বব-বম্ বলি'।

এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাশুলি বজ্র-ছড়ি,
ওরে ছড়ানো র'য়েছে কত যায় গড়াগড়ি!
মহা- সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট্ নিরবধি
তার ললাটে তপ্ত অভিশাপ-ছাপ এঁকে দিই আমি যদি!
তাই টিটকিরি দিয়ে হাহা হেসে উঠি,
সে হাসি গুমরি লুটায়ে পড়ে রে তুফান ঝঞ্ঝা সাইক্লোনে টুটি।

আমি বাজাই আকাশে তালি দিয়া 'তাতা-উর্-তাক্,'
আর সাঁও সোঁও ক'রে প্যাঁচ দিয়ে খাই চিলে-ঘুড়ি সম ঘুরপাক।
মম নিশাস আভাসে অগ্নি-গিরির বুক ফেটে ওঠে ঘুৎকার,
আর পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষ-ফুৎকার!

কাল- বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্র চণ্ড সুখে
পুচ্ছ সাপটি' খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে;
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী,
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি পিশাচের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্বনাশী!

আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে–
মম পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,
রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি রে!
ভগবান্ ? সে তো হাতের শিকার। –মুখে ফেনা উঠে মরে!
ভয়ে কাঁপিছে, কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের 'পরে।

অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া
অজগর কাল-কেউটা সে কোনো ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন–
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে;
আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম

বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম!
আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁপে ত্রাসে,
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হ'য়ে তারে গ্রাসে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ধূমকেতু– জ্যোতিষ্কবিশেষ, ঝাড়ুর মতো আকৃতিবিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক। **ললাট**– কপাল। **সাহারা-গোবী**– সাহারা ও গোবি নামের দুই মরুভূমি। **শনি**– অপদেবতা। **ভবানী**– দুর্গা। **বৈশ্বানর**– আগুন, আগুনের দেবতা। **দেবরাজ**– ইন্দ্র। **দম্ভোলি**– বজ্র। **কালনাগ**– ভয়ংকর সাপ। **পুচ্ছ**– লেজ। **পরমাই**– পরমায়ু। **ত্রিশূল**– শিবের অস্ত্র।

সারসংক্ষেপ :

'ধূমকেতু' কবিতাটি ১৩২৯ সালের শ্রাবণ ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নির্বাহী ও স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন নজরুল ইসলাম নিজেই।

'ধূমকেতু' কবিতাটিতে বিদ্রোহের যে রুদ্ররূপ প্রকাশিত তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে অন্যান্য কবিতায়। এজন্যে এ কবিতাটি তাঁর কাব্য জগতে একটি বিশেষ গৌরবময় আসনের অধিকারী।

আলোচ্য কবিতাটির মধ্যে নজরুলের কবিসত্তার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত। রাজনীতিক চেতনার একটি বিশেষ উত্তেজনাময় অধ্যায়ে 'ধূমকেতু' কবিতাটির জন্ম। নজরুল প্রথমে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন জানান। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন যখন কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হল, তখন সন্ত্রাসবাদ উদ্দীপনের মানসে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকা বের করেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যাতেই এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এখানে কবি নিজের স্রষ্টাকে শনি মহাকাল ধূমকেতু বলে ঘোষণা করেছেন। ধূমকেতুর অন্তর্নিহিত বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে বলেছেন—

"আমি আপনার বিষ-জ্বালা মদ পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া!"

এই বিষ-জ্বালা ও অস্থিরতা কবির বিদ্রোহকে তীব্রতর করে তুলেছে। কেউ কেউ কবিতাটির মধ্যে নাস্তিক্য-বুদ্ধিজনিত ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষকে আস্তিক্যবাদী নজরুলের কবি মানসের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই আপাত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য নজরুলের কবি-মানসের মধ্যে একটি স্থির বিশ্বাসের আলোকে সমন্বয় লাভ করেছে। যে তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত বৈলক্ষণ্য সংগতি ও ঐক্য পায়; তাকে ইংরেজিতে বলা হয় Pantheism। বাংলায় এই তত্ত্ব লীলাবাদ নামে পরিচিত। নজরুল এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে শাক্ত সংগীত, বৈষ্ণব গান, ইসলামি সংগীত প্রভৃতি বিষয়ক রচনার জনক হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছেন– "অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় তত্ত্বের নাম দেয়া যেতে পারে লীলাবাদ ইংরেজিতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন সবকিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে একই সঙ্গে বলা যায়– অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দু-চিন্তার শুধু নয়, সুফী চিন্তারও এটি মর্মকথা– এই হিন্দু মুসলমানের মাথা ভাঙা-ভাঙির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামা-সঙ্গীত ও বৃন্দাবন গাঁথা রচনা করে চলেছেন, তৌহিদেরও (একেশ্বর তত্ত্ব) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভেতরে।"

বলা যায়, নজরুলের প্রবল অহমিকার (egotism) তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। একই সঙ্গে কবিতাটি নজরুলের সাহিত্য ও শিল্পজীবনের প্রতীক। ভাব-ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসে কবিতাটি সার্থক। বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে নজরুলের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনি অতর্কিত। ধূমকেতুর মতোই তিনি যেন অকস্মাৎ উদিত হয়ে চারদিকে দারুণ উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে চিরকালের জন্যে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্রষ্টার শনি কে?

ক. শয়তান
খ. ধুমকেতু
গ. ত্রিভুবন
ঘ. মহেশ

২. ভগবান আজ ত্রাসে কাঁপে কেন?

ক. স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বড় হবে
খ. ধূমকেতু বিশ্ব গ্রাস করবে
গ. শয়তান অনন্তকাল অভিশাপ দেবে
ঘ. কবি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পুরাণে রয়েছে শনি যেখানে চোখ দেয় সেখানেই বিনাশ ও লয় ঘটে। সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিবেশে শনির মতোই নেতাজী সুভাষ বসু চেয়েছেন ব্রিটিশের লয়।

৩. উদ্দীপকের চেতনা কোন চরণটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।
খ. ওরে ভয় নাই তোর মার নাই।
গ. আমি অগ্নি কেতন উড়াই।
ঘ. ওরে ছড়ানো রয়েছে কত যায় গড়াগড়ি।

৪. উদ্দীপক ও 'ধূমকেতু' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. আবেগ ও উদ্দীপনা
ii. কবির অহমিকা
iii. জীবনের প্রশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ধূমকেতু কাকে চুষে খেতে চায়?

ক. ত্রিশূল
খ. পিনাক
গ. স্রষ্টা
ঘ. সম্রাট

৬. ধূমকেতু বুকে চিতা জ্বেলেছে কেন?

ক. ভগবানকে পোড়াবে
খ. গোঁফে তা দিতে
গ. ঈশ্বরকে ফাঁকি দিতে
ঘ. মৃত্যুর মুখে থুতু দিতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি বরং ঐতিহ্যকে সৃষ্টি করেছেন নতুন রূপে এবং নতুন জীবন ভাবনায়। তাই তাঁর কাব্যে রাম ও রাবণ ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি না করে জাতীয় জাগরণের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু যে কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. প্রলয়োল্লাস
খ. ধূমকেতু
গ. কামাল পাশা
ঘ. খেয়া-পারের তরণী

৮. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ঐতিহ্যের নতুন প্রয়োগে
ii. ঐতিহ্যের অপ প্রয়োগে

iii. শব্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

কত দশা বিরহিণীর– এক দুই তিন
দশটি
এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল
অভিসার
ঘর আর বিদেশ আঙিনা
আকুলতায় একাকার।

ক. কবি কেন ধূমকেতু হয়ে এসেছেন?

খ. কবি নিজেকে 'শনি' বলেছেন কেন? – বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ধূমকেতু' কবিতার বিপ্রতীপ বিষয়গুলো তুলে করুন।

ঘ. "সাহিত্যে ঐতিহ্য ও পুরাণের ব্যবহার অনিন্দ্য শিল্পসৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।" –উদ্দীপক ও 'ধূমকেতু' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

কবি মহাবিপ্লবের জন্য 'ধূমকেতু' হয়ে এসেছেন।

খ.

কবি নিজেকে 'শনি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শনি একটি পৌরাণিক চরিত্র। পুরাণ মতে কেউ শনির কোপানলে পড়লে তার ধ্বংস অনিবার্য । কবি মনে করেছেন তিনি ব্রিটিশ শাসকদের বিনাশের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। 'ধূমকেতু' রূপ কবির বিশ্বাস তার হাতের তুড়িতে ব্রিটিশ শোষক একদিন নিধন হবে। তাই কবি পররাজ্য গ্রাসকারী ব্রিটিশদের মৃত্যু দূতরূপে নিজেকে শনি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ.

উদ্দীপকের সঙ্গে বিষয়গত দিক থেকে 'ধূমকেতু' কবিতার অমিল রয়েছে।

ঐতিহ্য একটি জাতির গৌরবময় অংশ। সাহিত্যে ঐতিহ্যের রূপায়ণ নতুন মাত্রা এনে দেয়। ঐতিহ্য গড়ে তুলতে ধর্মবোধ সক্রিয় হলেও দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদিও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নজরুল তাঁর প্রতিবেশ, পরিবেশ ও আপন ঐতিহ্যের উপকরণে নির্মাণ করেছেন তাঁর কাব্যসৌধ।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বিরহী প্রেয়সীর প্রেমের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। প্রণয়ের আকুলতায় এখানে একটি নারী চরিত্রের ঘর আর বিদেশ একাকার হয়েছে। অন্যদিকে 'ধূমকেতু' কবিতায় দেখা যায়, ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে এলে পৃথিবীর যেমন বেসামাল অবস্থা ঘটে, শনি যেমন যেখানেই চোখ দেয় সেখানে বিনাশ ও ধ্বংস হয়, নজরুলও ব্রিটিশের কাছে তেমনি ভয়াবহ। কবি সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়িয়ে সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন– পুরাতন জরাজীর্ণ ঘুণে ধরা প্রচলিত স্থবির রীতিনীতিকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কবিতায় কবি ধূমকেতুর মতই অকস্মাৎ উদিত হয়ে চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন। নজরুলের প্রবল অহমিকার তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে 'ধূমকেতু' কবিতায়। তাই বলা যায়, 'ধূমকেতু' কবিতায় উদ্দীপক থেকে ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

ঘ.

সাহিত্যে ঐতিহ্য ও পুরাণের শিল্পসম্মত ব্যবহার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

সৃষ্টিশীল লেখকের হাতে ঐতিহ্য নতুন মাত্রায় রূপায়িত হয়। অনুপম শিল্প সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যেও ঐতিহ্যের সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। তিনি বেশির ভাগ মিথ বা ঐতিহ্য ধর্মীয় সূত্র হতে আহরণ করেছেন। কিন্তু এগুলো ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত না হয়ে জাতীয় জাগরণের উজ্জীবনী শক্তিরূপে কাজ করেছে।

উদ্দীপকের কবি কবিতাংশে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে রাধার বিরহকালীন দশটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিরহের আকুলতায় রাধার ঘর ও আঙিনা একাকার হয়ে যায়। 'ধূমকেতু' কবিতায়ও কবির ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ভারতশাসক ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কবিতায় কবি নিজেকে ধূমকেতু ও শনি বলে জ্ঞান করেছেন। ঐতিহ্য ও পুরাণ মতে ধূমকেতু যেমন পৃথিবীর জন্য চরম বিনাশকারী, শনিও তেমনি। ধূমকেতুর আগমনে পৃথিবী কেঁপে উঠে, আর শনির কোপানলে পড়লে সব বিনষ্ট হয়। তেমনি ধূমকেতু রূপ বিদ্রোহী কবি ব্রিটিশ শাসকদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। এই কবিতায় নজরুলের প্রবল অহমিকার তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপক ও 'ধূমকেতু' কবিতায় ঐতিহ্য ও পুরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। পুরাণ ব্যবহারের অন্তরালে নজরুলের চেতনায় জাতীয় জাগরণের প্রভাব প্রবল ছিল। তবু তিনি শাস্ত্র মন্থন করে অনুপম উপমা ও রূপক সংযোজন করে যে কবিতাগুলো নির্মাণ করেছেন তা আপন স্বভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্য-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।

ক. ধূমকেতু বিধাতার বুকে কী করে?

খ. 'ধূমকেতু' কবিতা অবলম্বনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের স্বরূপ তুলে ধরুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ধূমকেতু' কবিতার যে দিক থেকে অমিল রয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'ধূমকেতু' কবিতা উভয়টিই শোষণ-মুক্তির প্রত্যাশী হলেও চেতনা সমধর্মী নয়।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. ক

কামাল পাশা

ভূমিকা

তুরস্কের বীর সেনানী কামাল পাশার সংগ্রাম ও সাহসের কথা বর্তমান কবিতায় স্মরণ করেছেন নজরুল। কবিতা ও নাটকের অপূর্ব এক মেলবন্ধন ঘটেছে এ রচনায়। নজরুল ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তরুণ সমাজকে কামাল পাশার শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'কামাল পাশা' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- তুরস্কের জাতীয় বীর কামাল পাশা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- তুরস্ককে অবলম্বন করে কবির স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আসমানের আঙিনা তখন কারবালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা মহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহাকল্লোলে অম্বরধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুইজন করিয়া নিহত বা আহত সৈন্য বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলা-গুলির আঘাতে, বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্ত-রঞ্জিত। তাহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা সঙ্গীনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া ভাঙা খাটিয়া-আদি দ্বারা নির্মিত এক অভিনব চৌদোলে কামালকে রসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর কল্লোলের মতো তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহুদূর হইতে সে রণ-তাণ্ডব-নৃত্যের ও প্রবল ভেরী-তুরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।]

[সৈন্য-বাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,–]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর মার্চের হুকুম করিল : কুইক মার্চ!]

লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!!
লেফট্! রাইট্! লেফ্‌ট!!

[সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে লাগিল]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর : লেফ্‌ট্! রাইট্!]

সাব্বাস্ ভাই! সাব্বাস্ দিই, সাব্বাস্ তোর শম্‌শেরে!
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম-ঘর একদম-সে রে!
বল্ দেখি ভাই, বল হাঁ রে,
দুনিয়ায় কে ডর্ করে না তুর্কীর তেজ তলোয়ারে?

[লেফ্‌ট রাইট্! লেফ্‌ট!]

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশমন সব বিল্‌কুল্ সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া,
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!

দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :– সাবাস্ সিপাই! লেফ্‌ট! রাইট্! লেফ্‌ট!]

শির হ'তে এই পাঁও-তক্ ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভীতুদের শান্তি-বাণী শুন্‌বে কে?
পিন্ডারীদের খুন-রঙিন
নোখ-ভাঙা এই নীল সঙীন
তৈয়ার হেয় হর্দম ভাই ফাড়তে যিগর্ শত্রুদের।
হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ তোদের!
সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!
ক্ষীণ-জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্–
এম্‌নি ক'রে রে–
এম্‌নি জোরে রে–
ক্ষীণ–জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্!
ঐ চেয়ে দ্যাখ আস্‌মানে আজ রক্ত-রবির আভাস!
সাবাস জোয়ান্! সাবাস!

[লেফ্‌ট রাইট্! লেফট!]

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের!
পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!
কি বল ভাই শ্যাঙাত্?

হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
দনুজ-দলে দ'লতে দাদা এম্‌নি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর : রাইট্ হুইল! লেফ্‌ট! রাইট্! লেফ্‌ট!
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।]

আজাদ মানুষ বন্দী ক'রে, অধীন ক'রে স্বাধীন দেশ,
কুল মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,
মোদের হাতে তুর্কী নাচন নাচ্‌লে তাধিন্ তাধিন্ শেষ!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
বদ-নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই ক'রলে কিনা আল্লায়,
পিশাচগুলো প'ড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
হুররো হো!
হুররো হো–
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধ'র্‌তে আসেন তুর্কী তাজী,
মর্দ গাজী মোল্লা! –
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা!
হা হা হাঃ! হাঃ হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর :– সাবাস সিপাই! লেফ্‌ট! রাইট্! লেফ্‌ট্!
সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর–পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :- লেফ্‌ট হুইল! য়্যাজ য়ু ওয়্যার! –রাইট হুইল! –
লেফ্‌ট! রাইট! লেফ্‌ট]
[সৈন্যদের আঁখির সামনে অস্ত–রবির আশ্চর্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল।]

দেখ্‌ছ কি দোস্ত্ অমন ক'রে? হৌ হৌ হৌ!
সত্যি তো ভাই! সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুকটুকে বৌ লাল–পিরাহান–পরা,
স্বামীর খুনের ছাপ–দেওয়া, তায় ডগ্‌ডগে আন্‌কোরা! –

না না না, –কল্‌জে যেন টুকরো–ক'রে কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের, –শিউরে ওঠে গা'টা!
আস্‌মানের ঐ সিং–দরজায় টাঙিয়েছে কোন্‌ কসাই
দেখতে পেলে এক্ষুণি গ্যে এই ছোরাটা কল্‌জেতে তার বসাই!
মুণ্ডুটা তার খসাই!
গোস্বাতে আর পাই নে ভেবে কি যে করি দশাই!

[হাবিলদার-মেজর– সাবাস সিপাই! লেফ্‌ট! রাইট্‌! লেফ্‌ট।]
[ঢালু পার্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত ও আহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!
এমন কাঁচা জানগুলো খান্‌ খান্‌ ক'রেছে কোন্‌ সে চামার রে?
আহা কচি ভাইরা আমার রে!!

[সামনে উপত্যকা। হাবিলদার-মেজর– লেফ্‌ট ফর্ম্‌!
সৈন্য-বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল! হাবিলদার-মেজর :– ফরওয়ার্ড!
লেফ্‌ট! রাইট্‌! লেফ্‌ট!]

আস্‌মানের ঐ আঙ্‌রাখা
খুন–খারাবির রঙ্‌–মাখা,
কি খুবসুরৎ বাঃ রে বা!
জোর বাজা ভাই কাহার্‌বা!
হোক্‌ না ভাই এ কার্‌বালা ময়দান–
আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়–গান!
হোক্‌ না এ তোর কারবালা ময়দান!!
হুর্‌রো হো
হুর্‌রো–

[সামনে পার্বত্য পথ– হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল।
হুকুম দিয়া গেল:– "মার্কটাইম!" সৈন্যগণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল–]

দ্রাম্‌! দ্রাম্‌! দ্রাম্‌!
লেফট্‌! রাইট! লেফট্‌!
দ্রাম্‌! দ্রাম্‌! দ্রাম্‌!
আস্‌মানে ঐ ভাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল,
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,–
বুঝলে ভাই! ঐ নীল-সিয়াটা শত্রুদের
দেখতে নারে কারুর ভালো,
তাইতে কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের!
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ্য অসুর বল–
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
জালিম ওরা অত্যাচারী!

সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই!
জালিম ওরা অত্যাচারী!

সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই–
জোর অপমান ক'রলে ওরাই,
তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল-জল!–
ওরা হিংস্র পশুর দল!
ওরা হিংস্র পশুর দল!!

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল :–ফরওয়ার্ড! লেফ্‌ট হুইল–
সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল, –লেফট্‌! রাইট্‌! লেফট্‌!]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে ক'রে–
ওরা শহীদ হ'ল ম'রে।
পিট্‌নি খেয়ে পিঠ যে তোদের ঢিট হ'য়েছে! কেমন!
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন!
মুর্দারা সব যুদ্ধে আসিস্‌! যা যা!
খুন দেখেছিস্‌ বীরের? হাঁ দেখ্‌ টকটকে লাল কেমন গরম তাজা!

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল!]

মুর্দারা সব যা যা!!
এঁরাই বলেন হবেন রাজা!
আরে যা যা! উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :– সাবাস্‌ সিপাই!]

এই তো চাই! এই তো চাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই, নেই তো নাই!
এই তো চাই!!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহাদের
দেখিয়া সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল!]

মার্‌ দিয়া ভাই মার্‌ দিয়া
দুশমন সব হার গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
পরওয়া নেহি, যা নে দো ভাই যো গিয়া!
কিল্লা ফতে হো দিয়া!
হুররো হো!
হুররো হো!

[হাবিলদার-মেজর :– সাবাস্‌ জোয়ান! লেফ্‌ট! রাইট্‌!]

জোর সে চলো পা মিলিয়ে,

গা হেলিয়ে,
এম্‌নি ক'রে হাত দুলিয়ে!
দাদরা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে
ঢেউ-এর মতন যাই!
আজ স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা বেহেশ্‌তও না চাই!
আর বেহেশ্‌তও না চাই!

মুর্দা–মৃত।
[হাবিলদার–মেজর :– সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর–পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগরবাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহাদের চোখ–মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূদের মুখের বোরকা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চিৎকার করিয়া উঠিল!]

ঐ শুনেছিস্? ঝরকাতে সব বল্‌ছে ডেকে বৌ-দলে–
"কে বীর তুমি! কে চলেছে চৌদোলে?"
চিনিস্ নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব? –কামাল এ যে কামাল!
পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!
তা না হ'লে কা'র হবে আর রৌশন এমন জামাল?
কামাল এ যে কামাল!!
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ি সব সামাল!
ঘর-বাড়ি সব সামাল!!
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,
ডগ্‌মগিয়ে জোশ উঠেছে!
সাম্‌নে থেকে পালাও!
শোহ্‌রত দাও, নওরাতি আজ! হর ঘরে দীপ জ্বালাও!
সামনে থেকে পালাও
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও!!

[হাবিলদার-মেজর :– লেফ্‌ট ফর্ম! রাইট! লেফ্‌ট্! ফরোয়ার্ড!]

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখাভর্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে এবং কতকগুলি অ-সামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙ্গাইয়া চলিতেছে।]

ইস্! দেখেছিস্! ঐ কা'রা ভাই সাম্‌লে চলেন পা,
ফ'স্‌কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!

ও তাই শিউরে ওঠে গা!
হাঃ হাঃ হাঃ!

ম'রলো যে সে ম'রেই গেছে,
বাঁচলো যারা রইল বেঁচে।
এই তো জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি আর আঃ?
মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার–মেজর অর্ডার দিল– "ফর্ম ইনটু সিঙ্গল লাইন"। এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ও আহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি অন্তর্পণে "শ্লো মার্চ" করিয়া পার হইতে লাগিল।]

সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই–
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধ'রে কল্‌জেখানা পেষে!

নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই কলজেখানা পেষে!!

ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!
বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা!
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!!
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা!!
অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা,
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা!
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর! ঘুমো!
আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো।

হতভাগা রে!
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে
না জানি কোন্ ফুট্‌তে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায়!
তরুণ জীবন এম্‌নি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোনো প্রিয়ায়!
অরুণ খুনের তরুণ শহীদ! হতভাগা রে!
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে!
তাই যত আজ লিখনে-ওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি–সে জোর লেখে!
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
ম'রলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, "জোর ম'রেছে দশটা হাজার সৈনিকে!"
আঁখির পাতা ভিজলো কি না কোনো কালো চোখের
জান্‌লে না হায় ঐ জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!
প'চে মরিস পরিখাতে, মা-বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা'।
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই? আহা!–

আয় ভাই্ তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার শাড়ি প'রবে এখন প'শবে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!—
ভাব্‌তে নারি, গোরের মাটি ক'রবে মাটি এ মুখ কেমন ক'রে—
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে!
বিদায়-বেলায় আরেকটি বার দিয়ে যা ভাই চুমো!
অনাদরের ভাইটি আমার! মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো!!

[নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক ব'লেছ দোস্ত তুমি!
চোস্ত কথা! আয় দেখি তোর হস্ত চুমি!
মৃত্যু এরা জয় ক'রেছে, কান্না কিসের?
আব্—জম্—জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সি বিষের!
কে ম'রেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে!!
দেশ বাঁচাতে আপ্‌নারি জান্ শেষ ক'রেছে!
বেশ করেছে!
শহীদ ওরাই শহীদ!
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরি লোহিত!
শহীদ ওরাই শহীদ!

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহারীর আনোয়ার পাশা বহু সৈন্য-সামন্ত ও সৈনিকের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া "ডবল মার্চ" করিতে লাগিল।]

হুর্‌রো হো!
হুররো হো!
ভাই—বেরাদার পালাও এখন! দূর রহো! দূর রহো!
হুর্‌রো হো! হুর্‌রো হো!

[কামাল পাশাকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল।]

হৌ হৌ হৌ! কামাল জিতা রও!
কামাল জিতা রও!
ও কে আসে! আনোয়ার ভাই? —
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!
জোর নাচো ভাই! হর্দম দাও লাফ্
আজ জানোয়ার সব সাফ্!
হুররো হো! হুররো হো!!

সব-কুচ আব্ দূর্ রহো! —হুর্‌রো হো! হুর্‌রো হো!!
রণ জিতে জোর মন মেতেছে! —সালাম সবায় সালাম! —

নাচ্‌না থামা রে!
জখমী—ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে!
নাচ্‌না থামা রে!

[আহতদের নামাইতে নামাইতে]

কে ভাই? হাঁ, হাঁ, সালাম।
—ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ-সালার কামাল ভাই-এর কালাম!

[সেনাপতির অর্ডার আসিল]

"সাবাস! থামো! হো! হো!
সাবাস্! হল্ট! এক! দো!!"

[এক বিমেষে সমস্ত কলরোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনো কিন্তু তারায় তারায় যেন ঐ বিজয়-গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলিয়া গেল।]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

তু নে– তুমি। **কামাল কিয়া–** অভাবনীয় কাণ্ড করলে। অসম্ভবকে সম্ভব করলে। **শমশেরে–** তরবারিকে। **খুব কিয়া–** আচ্ছা করেছ। **বুজদিল–** ভীরু, কাপুরুষ। **পাঁও তক–** পা পর্যন্ত। **বিলকুল সাফ হো গিয়া–** সবকিছু একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। **নেস্ত-নাবুদ–** ধ্বংস-বিধ্বংস। **কুল মুলুক–** সমস্ত দেশটা। **আজাদ–** মুক্ত। **জের–** পরাভূত। **বদ-নসিব–** দুর্ভাগ্য, মন্দ কপাল। **তাজী–** যুদ্ধের ঘোড়া। **পিরহান–** পিরান, পোশাক। **গোস্বা–** ক্রোধ, রাগ। **খুবসুরৎ–** সুন্দর। **সিয়া–** কৃষ্ণবর্ণ। **জালিম–** উৎপীড়ক। **মুর্দা–** মৃত। **জামাল–** রূপ। **জোশ–** উত্তেজনা। **শোহ্‌রত–** ঘোষণা। **নওরাতি–** উৎসব-রাত্রি। **গোর–** কবর, সমাধি। **আব-জম-জম–** জমজমের পানি, মন্দাকিনী সুধা। **জিতা রও–** বেঁচে থাক। **সিপাহসালার–** প্রধান সেনাপতি। **কালাম–** হুকুম। **জখমী–** ঘায়েল, আহত।

সারসংক্ষেপ :

'কামাল পাশা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম-ভারত'-এ। সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত এই কবিতা সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী'র [শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল) মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

> "তুর্কীর নব-সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার নামে যে কবিতাটি রচিত হয়েছে সেটি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। গদ্যপদ্যময় কবিতার সংস্কৃত নাম চম্পু; সে হিসেবে এই কবিতাটিকে চম্প বলিলে ইহার বিশেষত্ব বুঝানো যায় না, কারণ ইহাতে যে উদ্দীপনা আছে প্রাচীন চম্পুতে তাহা পাই না। যুদ্ধের অভিযানে জয়ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই, তাহা এ দেশের সাহিত্যে নূতন। কবির ছন্দ ও ভাষায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; ইরান ও ভারতের এমন অপূর্ব মিলন, মোগল সম্রাটদের আমলের নামজাদা হিন্দী সাহিত্যেও দেখি নাই, বঙ্গের কবি সমাজে নজরুল ইসলামের স্থান অতি উচ্চে।"

জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কামাল পাশা নজরুলের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। অনেক জায়গায় তিনি কামাল পাশার শৌর্যবীর্য সম্পর্কে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেছেন।

কামালকে উপলক্ষ করে দৃপ্ত সৈনিকের আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও বেদনার মধ্যে নজরুল নিজের দেশের পরাধীনতার অর্ন্তজ্বালা ও স্বাধীনতার কামনাকেই রূপ দিয়েছেন এ কবিতায়। নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে যেমন কবি সমর্থন

করেছেন, তেমনি অন্য দেশের স্বাধীনতা ধ্বংসকারী যুদ্ধের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যদি কেউ স্বদেশের প্রতি আঘাত হানে, সেখানে প্রত্যাঘাত করাই সৈনিকের ধর্ম। অন্যদেশ লুণ্ঠন করা সৈনিকের সত্যনীতি নয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন এবং স্বাধীনতা-হন্তার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করে ইংরেজ কবি শেলী এবং বায়রন দুজনেই নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর কবিতা লিখেছিলেন। নজরুল কাব্যেও অনুরূপ যুদ্ধের আবেগ ও গৌরবময় রূপ যেমন ফুটেছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে তার কুৎসিত ও ঘৃণ্যমূর্তি। স্বাধীনতার সংগ্রামকেই নজরুল সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। দেশের মুক্তি সাধনায় যুদ্ধ করে তিনি শহিদ হতে বলেছেন দেশবাসীকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তিনি মোটেই সমর্থন করেননি। তিনি বুঝেছেন, আঘাতকে আঘাত দিয়েই প্রতিরোধ করতে হয় এবং মহৎ কার্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হওয়া ভীরুরই শোভা পায়। 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট রূপ বর্তমান। বীর রসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণে কবিতাটির মানবিক আবেদন অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো স্থানে ব্যঙ্গের কশাঘাত থাকায় মূলবক্তব্য হয়েছে মর্মভেদী। কামালের মুক্তি সংগ্রামের বিজয়োল্লাসে কবি আনন্দে ও উত্তেজনায় দিশেহারা। দেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে আত্মবিসর্জনকে কবি মহৎ ধর্ম বলে মনে করেন। মৃত্যঞ্জয় শহিদদের জন্যে কবি অশ্রুপাতের বিরোধী, কেননা দেশ সেবার গৌরবে তারা ধন্য।

যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তির পাশাপাশি কবির চোখে তার বেদনাবিধুর রূপ ও উদঘাটিত হয়েছে। সৈনিকের জীবন ও তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়ে সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, লোকে তার জন্যে দুঃখও প্রকাশ করে, কিন্তু কবি জানেন, তার ব্যথার প্রকৃত দরদী কেউ নেই।

তাই যত আজ লিখনে-ওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি—সে জোর লেখে!
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
ম'রলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, "জোর ম'রেছে দশটা হাজার সৈনিকে!"

এই কারুণ্য মিশ্রিত ব্যঙ্গে যুদ্ধের অন্তঃসারশূন্যতা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা এবং সর্বোপরি সৈনিকজীবনের ট্র্যাজেডি তীব্র ও তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো আমাদের মর্মভেদ করে।

সৈনিকদের মার্চের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিতাটিতে তাদের জীবনের উত্তেজনা ও বিষণ্ণতা আশ্চর্য রূপে ফুটে উঠেছে। কয়েকটি উপমা ব্যবহার করায় যুদ্ধের রুঢ় নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন মূর্তি অনেক বেশি ভয়ংকরতায় প্রতিফলিত হয়েছে। সৈনিকজীবনের অভিন্নতা নিয়ে সামাজিক জীবনে ফিরে আসায় এ রকম মানবিক আবেদনপূর্ণ পংক্তি রচনা সম্ভব :

আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার শাড়ি প'রবে এখন প'শবে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!—
ভাব্‌তে নারি, গোরের মাটি ক'রবে মাটি এ মুখ কেমন ক'রে—
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে!

বাংলা সাহিত্যে 'কামাল পাশা' একটি অপূর্ব বৈশিষ্টপূর্ণ কবিতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কামাল পাশা কে?

ক. তুর্কি সেনানায়ক
খ. গ্রিক সম্রাট
গ. কারবালা বীর
ঘ. আনাতোলিয় সৈন্য

২. 'কামাল পাশা' কবিতায় কেন 'ডাকাত' বলা হয়েছে?

ক. সৈন্যদের ত্যাগে
খ. শোর ওঠায়
গ. স্বাধীনতা হরণে
ঘ. পরাধীনতার যন্ত্রণায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা রোমের দেউলে,
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক–

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'কামাল পাশা' কবিতার যে চরণটি সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ। খ. দুনিয়ায় কে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে?
গ. ঐ চেয়ে দ্যাখ আসমানে আজ রক্ত-রবির আভাস! ঘ. হিংসুক দল! জোর তুলেছি শোধ তোদের!

৪. উদ্দীপক ও 'কামাল পাশা' কবিতার উপজীব্য–

i. স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা
ii. সৈনিকের ট্র্যাজেডি
iii. পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কামাল পাশা কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ খ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ
গ. চৌপদী পয়ার ছন্দ ঘ. সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক

৬. কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে 'কামাল পাশা'–

ক. নব জাগরণের প্রতীক খ. গ্রীক সেনাবাহিনীর ত্রাণকর্তা
গ. কারবালা ময়দানের শহিদ ঘ. তুরস্কের প্রসিদ্ধ হাবিলদার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মাস্টার দা সূর্যসেন দেশের মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জনকে মহৎ ধর্ম বলে মনে করেন। মৃত্যুঞ্জয় শহিদদের জন্যে তিনি অশ্রুপাতের বিরোধী, কেননা দেশসেবার গৌরবে তারা ধন্য।

৭. উদ্দীপকের সূর্যসেনের সঙ্গে 'কামাল পাশা' কবিতার কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. তুর্কি বীর কামাল খ. আনোয়ার পাশা
গ. হাবিলদার মেজর ঘ. শমশের

৮. উদ্দীপক ও 'কামাল পাশা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. পরাজয়
ii. যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা
iii. দেশপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ নজরুল মানসকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল। এই যুদ্ধে কামালকে উপলক্ষ করে বিজয়ী সৈনিকের উল্লাস ও বেদনার মধ্যে তিনি ভারতের পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে উপলব্ধি করেছেন। নজরুল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেমন সমর্থন করেছেন, তেমনি অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণকারী যুদ্ধের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা

প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে যদি কেউ স্বদেশের প্রতি আঘাত হানে সেখানে প্রত্যাঘাত করাই সৈনিকের ধর্ম। অন্য দেশের স্বাধীনতার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা সৈনিকের উচিত নয়।

ক. 'কামাল পাশা' কবিতায় কে ক্ষেপেছে?

খ. 'কামাল পাশা' কবিতায় কবি তুর্কি বীর কামালের বন্দনা করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের চেতনা 'কামাল পাশা' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কামাল পাশা' পরাধীন দেশে গণ-মানবের জাতীয় জাগরণের প্রতীক।" –উদ্দীপক ও 'কামাল পাশা' কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'কামাল পাশা' কবিতায় পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ক্ষেপেছে।

খ.

তুর্কি বীর কামাল পাশার চেতনাকে অনুসরণ করে কবি এদেশের বাঙালি মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। গ্রিকরা তুরস্ক আক্রমণ করে তাদের পরাধীন করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশবাসী কামালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবি প্রত্যাশা করেছেন কামালের সংগ্রামী জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এ দেশের মুসলিম সম্প্রদায় থেকেও একজন নেতার আবির্ভাব ঘটবে। তার নেতৃত্বে দেশের মানুষ ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের তাড়িয়ে দিয়ে একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ গড়বে। তাই কবি তুর্কি বীর কামাল পাশার বন্দনা করেছেন।

গ.

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মাধ্যমে উদ্দীপকের চেতনা 'কামাল পাশা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কামাল পাশা তুরস্কের মহান জননায়ক। তিনি আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা বলে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গ্রিস তুরস্ক আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তুর্কি জননেতা বীর কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুরস্ককে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে নজরুল অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে বিজয়ী সৈনিকের উল্লাসের মধ্যে তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে উপলব্ধি করেছেন। আবার অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণকারী যুদ্ধের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। 'কামাল পাশা' কবিতাটিতেও কামালকে উপলক্ষ করে তাঁর স্বাধীনতার চেতনা সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। কামালের মুক্তিসংগ্রামের বিজয়োল্লাসে কবি আনন্দে ও উত্তেজনায় বিভোর হয়েছেন। তিনি দেশবাসীকে দেশের মুক্তিসাধনায় যুদ্ধ করে শহিদ হতে বলেছেন। বলা যায়, উদ্দীপকের চেতনা এভাবে 'কামাল পাশা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

'কামাল পাশা' কবিতায় তুর্কি বীর কামাল নজরুল মানসে পরাধীন দেশে জাতীয় জাগরণের প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

মুক্তির লড়াইয়ে তুরস্কের একটি গৌরবময় অধ্যায় রয়েছে। এটা হচ্ছে গ্রিসের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই। এ লড়াইয়ে কামাল পাশা প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে তুর্কি জনগণের মহান নায়কে পরিণত হন। জাতির মুক্তিসংগ্রামে কামাল আতাতুর্কের জীবনবাজি লড়াই মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

'কামাল পাশা' কবিতায় জননায়ক কামালকে উপলক্ষ করে বীর সৈনিকের উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার অনেক স্থানে কবি কামালের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা উচ্চারণ করেছেন। দেশের মুক্তি সাধনায় তিনি দেশবাসীকে কামালের মতো যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নজরুল-মানসে কামালের একটি গৌরবময় রূপ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে নজরুল তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহিত হয়েছিলেন। কামালের নেতৃত্বে যুদ্ধবিজয়ী সৈনিকের উল্লাস তাকে আবেগাপ্লুত

করেছিল। এর অন্তরালে অবশ্য নজরুল ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কামালের মত তিনি প্রত্যাশা করেছেন এমন এক সৈনিককে যে স্বদেশের প্রতি যদি কেউ আঘাত হানে সেখানে প্রত্যাঘাত করবে।

উদ্দীপক ও 'কামাল পাশা' কবিতায় তুর্কি বীর কামাল উজ্জীবনী পুরুষ। বিশ্বের নিপীড়িত জনতার নিকট তিনি মুক্তির বার্তাবাহক। তিনি পরাধীন দেশের অন্তর্জ্বালা নিবারক ও স্বাধীনতার কামনা। তাই উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বলা যায়, কামাল পাশা পরাধীন দেশে গণ-মানবের জাতীয় জাগরণের প্রতীক।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বিশ্বে যখন 'যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি' অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ কামাল এলো তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারি নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝঞ্ঝার মতো, রুদ্রের মহারোষের মতো। অত্যাচারীর মুখে গোখরো সাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে ক্ষ্যাপা ছেলে, ঘুষি মেরে তার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিন ভুবন দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর।

ক. তুর্কি সৈন্যরা বেহেশ্‌তও চায় না কেন?

খ. 'পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা 'কামাল পাশা' কবিতার 'কামাল' চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. ক ৮. গ

আনোয়ার

ভূমিকা

এ কবিতায়ও নজরুল তুরস্কের বীর সেনানী আনোয়ার পাশার সৈন্যদলের এক বীর যোদ্ধার বয়ানে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখানেও কবিতার সঙ্গে মিশেছে নাট্যরীতি।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'আনোয়ার' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- তুর্কী বীর আনোয়ারের সংগ্রামী চেতনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- তরুণ কবির কণ্ঠে দুনিয়ার মুসলিম সমাজের দূরবস্থার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলিম সমাজে প্রাণের উদ্দীপনা আনার প্রয়াস উপলব্ধি করে তার বিশ্লেষণ করতে করবেন।

মূলপাঠ

[স্থান– প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনষ্ট্যান্টিনোপল্।
কাল– অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।]

চারিদিক্ নিস্তব্ধ নির্বাক। সেই মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রীর পায়চারীর বিশ্রী খট্ খট্ শব্দ। ঐ জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দী। তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন– সমস্ত কিছুতে যেন একটা ব্যথিত বিদ্রোহের তিক্ত ক্রন্দন ছল-ছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক রোধ হইতেছিল।

সেই দিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ, জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে উৎপীড়নের লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার মা'কে দেখিতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিমানী-সিক্ত বায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, "হায় মাতৃহারা!"

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ-রোষে নিজের বামবাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহ-শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারে বারে নিপতিত হইয়া কারাগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল–– "আনোয়ার!"

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত্-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আফ্সোস্!
বখ্তেরই সাফ্ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শমশের– পড়ে আছে খাপ কোষ!
আনোয়ার! আফ্সোস্!

আনোয়ার! আনোয়ার!

সব যদি সুম্‌সাম, তুমি কেন কাঁদ আর?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!
আনোয়ার! আর না!
দিল্‌ কাঁপে কার না?
তলওয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছ স্মার্ণা,
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন কর– খুন কর ভীরু যত জানোয়ার!
আনোয়ার! জিঞ্জির-
পরা মোরা খিঞ্জীর?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোনা রিণ্‌-ঝিন্‌কির,–
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির!
গর্দানে জিঞ্জির!

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুর্বল এ গিদ্‌ধড়ে কেন তড়পানো আর?
জোরওয়ার শের কই? –জের্‌বার জানোয়ার।
আনোয়ার! মুশকিল
জাগা কঞ্জুশ-দিল,
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল!
ভাই আজ শয়তান, ভাই-এ মারে ঘুষ কিল!
আনোয়ার! মুশ্‌কিল!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর!
কোথা খোঁজো মুসলিম? –শুধু বুনো জানোয়ার।
আনোয়ার! সব শেষ!–
দেহে খুন অবশেষ!–
ঝুটা তেরি তল্‌ওয়ার ছিন্‌ লিয়া যব্‌ দেশ
আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন-রব পেশ!!
আনোয়ার! সব শেষ!

আনোয়ার! আনোয়ার!
জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর!
আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার।
আনোয়ার!– কেউ নাই।
হাতিয়ার?– সেও নাই!
দরিয়াও থম্‌থম্‌ নাই তাতে ঢেউ, ছাই!
জিঞ্জির গলে আজ বেদুঈন-দে'ও ভাই!

আনোয়ার! কেউ নাই!

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জান্‌টা বাঁচানো সার!
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার–
তল্‌ওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিক্‌দার!
আনোয়ার! ধিক্কার!

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর
রুধিরের লোহু আঁখি!– শয়তানী জানো সার!
আনোয়ার! পঞ্জায়!
বৃথা লোকে সম্‌ঝায়,
ব্যথাহত বিদ্রোহী দিল্‌ নাচে ঝঞ্ঝায়,
খুন-খেকো তল্‌ওয়ার আজ শুধু রণ্‌ চায়,
আনোয়ার! পঞ্জায়!

আনোয়ার! আনোয়ার!
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার,
ঘরে যত দুশমন, পরে কেন হানো মার?
আনোয়ার! এস ভাই!
আজ সব শেষ-ও যাই!–
ইস্‌লামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!–
তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!!

[সহসা কাফ্রী সাম্রীর ভীম চ্যালেঞ্জ প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনির মত হুঙ্কার দিয়া উঠিল– "এয়্‌ নৌজওয়ান, হুশিয়ার।" অধীর ক্ষোভে তিক্ত রোষে তরুণের দেহের রক্ত টগবগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহার কটিদেশের, গর্দানের, পায়ের শৃঙ্খল খান খান হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতের শৃঙ্খল টুটিল না। সে সিংহ-শাবকের মত গর্জন করিয়া উঠিল–]

এয়্‌ খোদা! এয়্‌ আলী! লাও মেরী তল্‌ওয়ার!

[সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনী মাতৃ-মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। ঐ মাতৃ-মূর্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরও শৃঙ্খলিতা ভিখারিণী বেশ। তাঁহাদের দুজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়া করুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল–]

ও কে? ও কে ছল আর?
না– মা, মরা জান্‌কে এ মিছে তরসানো আর!
আনোয়ার! আনোয়ার!!
"আঃ– আঃ– আঃ–!"

[কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিনিদ্র বন্দী তরুণ সেনানীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারের বন্ধ রন্ধ্রে তাহারই আর্ত প্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল–]

আজ নিখিল বন্দীগৃহে ঐ মাতৃ মুক্তি-কামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে কোন্ অচিন্ দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিবে জানি না। তখন হয় তো হারা-মা-আমার আমায় "তারার পানে চেয়ে চেয়ে" ডাকিবেন। আমিও হয় তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে, –"আসিবে সেদিন আসিবে।"]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

দিলওয়ার– সাহসী। **বখ্‌ত**– অদৃষ্ট, কপাল। **জোশ**– উত্তেজনা। **সুমসাম**– নিঝ্‌ঝুম, নীরব। **জিঞ্জির**– শৃঙ্খল। **খিঞ্জীর**– শুকর। **রোণা**– ক্রন্দন। **জোর্‌ওয়ার**– বলবান। **শের**– বাঘ। **গিদ্‌ধড়**– শৃগাল। **জেরবার**– ক্ষত-বিক্ষত। **কঞ্জুশ্-দিল**– কৃপণ মন। **হাতিয়ার**– অস্ত্র। **বিয়াবান**– মরুভূমি। **দিক্‌দার**– তিক্ত-বিরক্ত। **তেগ**– তলোয়ার। **তরসানো**– দুঃখ দেওয়া। **ফরিয়াদ**– অভিযোগ, আবেদন।

সারসংক্ষেপ :

'আনোয়ার' কবিতাটি ১৩২৮ কার্তিকের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্যান-ইসলামভাবাপন্ন আনোয়ার পাশা ও সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী কামাল পাশার মধ্যে আর্দশের বিরোধ থাকলেও নজরুল এই দুই বীর নেতাকেই তাঁদের শৌর্যবীর্যের কথা মনে করে অভিনন্দন জানাতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। 'আনোয়ার' কবিতায় নজরুল এক তরুণবাদীর কণ্ঠে দুনিয়ার মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারের শৌর্যবীর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম সমাজের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তার মধ্যে নতুন প্রাণের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে তিনি আনোয়ারের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আফ্‌সোস্!
বখ্‌তেরই সাফ্ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শমশের–পড়ে আছে খাপ কোষ!
আনোয়ার! আফ্‌সোস্!

শেষ পর্যন্ত কবির আহ্বান; —

আনোয়ার! এস ভাই!
আজ সব শেষ-ও যাই!–
ইস্‌লামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!-
তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!!

কবিতাটির শেষে কবি মন্তব্য করেছেন—

"আজ নিখিল বন্দীগৃহে ঐ মাতৃ মুক্তি-কামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে কোন্ অচিন্ দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিবে জানি না। তখন হয় তো হারা-মা-আমার আমায় "তারার পানে চেয়ে চেয়ে" ডাকিবেন। আমিও হয় তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে, –"আসিবে সেদিন আসিবে।"

কবি এখানে জাতির মুক্তিকামনাকে নিখিলের পটভূমিকায় উপলব্ধি করে শান্তি ও মুক্তির দিন অবশ্যই আসবে, এই বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করেছেন। জন্মান্তরের নতুন রূপে এসে তিনি মুক্ত জীবনকে আস্বাদন করতে উন্মুখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আনোয়ার কে ছিলেন?

ক. ফরাসি সেনানায়ক
খ. স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক
গ. গ্রিসের মহান অধিপতি
ঘ. নব্য তুর্কি আন্দোলনের নেতা

২. 'আনোয়ার' কবিতায় 'কথক' সিংহের মতো গর্জন করেছেন কেন?

ক. স্বদেশের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায়
খ. স্বপ্নে মাকে দেখে
গ. মুসলিম সমাজের পরাধীনতায়
ঘ. দরিয়ার নিস্তব্ধতা দেখে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'পাঞ্জেরি' কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি জাতীয় জীবনে বিরাজমান সঙ্কট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন চরণটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার।
খ. ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল।
গ. দরিয়াও থম থম নাই তাতে ঢেউ, ছাই।
ঘ. আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার।

৪. উদ্দীপক ও 'আনোয়ার পাশা' কবিতায় মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. উদ্দীপনা সৃষ্টিতে
ii. যুদ্ধংদেহী মনোভাবে
iii. সচেতন নেতৃত্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'আনোয়ার' কবিতায় মুসলিম জাতিকে কী বলা হয়েছে?

ক. কাফ্রি সান্ত্রী
খ. পোষা জানোয়ার
গ. স্বাধীনতার শিক্ষক
ঘ. বুনো জানোয়ার

৬. 'গর্দানে জিঞ্জির' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মুসলিমদের পরাজয়ের শৃঙ্খল
ক. তুর্কিদের পরাজয়ের চিহ্ন
গ. আনোয়ারের বিজয়ের প্রতীক
ঘ. কাফ্রি সান্ত্রীর নৃশংসতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্য পার।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আনোয়ার' কবিতার কোন চরণটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার।
খ. বৃথা লোকে সম্‌ঝায়
গ. বেঈমান জানে শুধু জান্‌টা বাঁচানো সার !
ঘ. ব্যথাহত বিদ্রোহী দিল্ নাচে ঝঞ্ঝায়।

৮. উদ্দীপক ও 'আনোয়ার' কবিতায় কবির প্রত্যাশা–

i. অমরত্ব
ii. মুক্ত স্বদেশ
iii. জীবন বাঁচানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

ক. 'আনোয়ার' কবিতায় বন্দী তরুণ সেনানী কার কথা স্মরণ করে?

খ. 'আনোয়ার' কবিতাটি রচনার কার্যকারণ পর্যালোচনা করুন।

গ. উদ্দীপকটি 'আনোয়ার' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'আনোয়ার' কবিতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিখিলের পটভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'আনোয়ার' কবিতায় বন্দী তরুণ সেনানী তার অস্ত্রগুরু আনোয়ারকে স্মরণ করে।

খ.

কবি মুসলিম সমাজের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কবিতাটি রচনা করেছেন।

'আনোয়ার' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম প্যান-ইসলাম ভাবাপন্ন জননায়ক আনোয়ার পাশাকে অভিনন্দন জানাতে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। 'আনোয়ার' কবিতায় নজরুল এক তরুণ সেনানীর কণ্ঠে মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারের শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করেছেন। কবিতাটিতে কবি জাতির মুক্তি কামনাকে নিখিলের পটভূমিকায় উপলব্ধি করেছেন। আনোয়ারকে উপলক্ষ করে জাতির মুক্তির বিষয়টি কবিতাটি রচনায় কার্যকারণ হিসেবে কাজ করেছে।

গ.

উদ্দীপনার দিক থেকে 'আনোয়ার' কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আনোয়ার পাশা তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন বীর সেনানী। এই বীর সেনানী বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মুক্তিসংগ্রামে উজ্জীবিত করেছেন। কবি মনে করেছেন মুসলিম সমাজের দুর্দশায় আনোয়ার পাশা নতুন প্রাণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। তুর্কি বীর পাশার শৌর্যবীর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি মুসলমানও একসময় পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে।

'আনোয়ার' কবিতায় তুর্কিদের জাতীয় নেতা আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের এক তরুণ সেনানীর কথা বর্ণিত হয়েছে। বন্দী অবস্থায় সেনানির চোখে ভেসে ওঠে তার অস্ত্রগুরু মহান নেতা আনোয়ারের মুখ। মৃত্যুর পূর্বে দ্রোহী দেশপ্রেমিক তরুণ তার নেতা আনোয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসঘাতকদের উদ্দেশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করে। অন্যদিকে উদ্দীপকে মহামতি লেনিনের অন্যায়ের বাঁধ ভাঙ্গার কথা বলা হয়েছে। লেনিন অন্যায়ের মুখে একটি প্রতিবাদী চেতনা। উদ্দীপকের কবি লেনিনের চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে নিজেকে লেনিন মনে করেছেন। এভাবে উদ্দীপনা সৃষ্টির বিষয়ে আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও 'আনোয়ার' কবিতায় গণমানবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিখিলের পটভূমিতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বিশ্বমানবের মুক্তি প্রয়াসী। তিনি কেবল নিজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভাবেননি, বরং পৃথিবীর যে কোনো অত্যাচারিত জাতির সপক্ষে কলম ধরেছেন। কবি যেন বিশ্বের সকল জাতির মুক্তিসংগ্রামের সহযাত্রী হয়ে উঠেছেন।

'আনোয়ার' কবিতায় তুর্কি জননায়ক আনোয়ারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তুর্কি জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধে মহাবীর আনোয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে এসেছে অনেক প্রাণপ্রদীপ্ত যুবক। দেশের জন্য তারা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। উদ্দীপকেও উল্লিখিত হয়েছে একজন মহান নেতার কথা, যিনি বিশ্বকে মুক্তির নয়া দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন। এ মুক্তির পালে লাগে উদ্দাম বাতাস আর তার শ্যামল তীরে চোখে পড়ে আন্দোলিত ঘাস।

তুরস্কের আনোয়ার পাশা ও লেনিনের মুক্তি চেতনা কোনো নির্দিষ্ট দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের কবি তাঁদের নিকট থেকে মানব মুক্তির প্রণোদনা পেয়েছেন। জাতির মুক্তিকামনাকে এই দুই কবি নিখিলের পটভূমিকায় উপলব্ধি করেছেন। জন্মান্তরের নতুন রূপে এসে তারা মুক্ত জীবনকে আস্বাদন করতে উন্মুখ। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'আনোয়ার' কবিতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিখিলের পটভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

হে বনি ইসরাইল দেশের অগ্রনায়ক বীর
অঞ্জলি দিনু 'নীলে'র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি।
ময়লা-শীতলা সুজলা এ দেশে– আশিস্ করিও খালি–
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।

ক. 'আনোয়ার' কবিতাটি কোন চরিত্রকে নির্ভর করে রচিত হয়েছে?

খ. 'আনোয়ার' কবিতা অবলম্বনে সাজাপ্রাপ্ত তরুণের দেশপ্রেমের স্বরূপ আলোচনা করুন।

গ. উদ্দীপকের বনি ইসরাইল বীর 'আনোয়ার' কবিতায় কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা কর।

ঘ. "উদ্দীপকে 'উড়ে আসা মরুর দু'মুঠো বালি' 'আনোয়ার' কবিতায় মুক্তির চেতনাকেই উদ্দীপ্ত করে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. খ

রণ-ভেরী

ভূমিকা

'রণ-ভেরী' একটি ঐতিহাসিক কবিতা। গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আঙ্গোরা-তুরস্ক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ হতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবি পাঠানোর প্রস্তাব শুনে কবি এই কবিতা রচনা করেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'রণ-ভেরী' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- মুসলিম সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি কবির বিরূপ মনোভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রচলিত সমাজের শৃঙ্খল ভাঙার আহ্বান উপলব্ধি করে তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

[গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]

ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়–
ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়!
আজ শখ করে
জুতি টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশমন পায় পায় –
ওরে আয়!
তোর জান্ যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পঞ্জায়!
তোর মান যায় প্রাণ যায়–
তবে বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সম্‌ঝায়!
রণ দুর্মদ রণ চায়!

ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!
ওরে আয়!
ঐ ঝন-নন-নন রণ ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
শুনি এই ঝঞ্ঝনা-ব্যঞ্জনা নেবে গঞ্জনা কে রে হায়?
ওরে আয়!

তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি লজ্জায়,
ওরে সব যায়,
তবু কবজায় তোর শম্‌শের নাহি কাঁপে আফ্‌সোসে হায়?
রণ– দুন্দভি
শুনি খুন-খুবী
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলীরের গোর্দায়?
ওরে আয়!

মোরা দিলাবার খাঁড়া তলওয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়,
তারা খিঞ্জীর, যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি' মূরছায়।
আরে দূর দূর।
যত কুক্কুর
আসি' শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি
চ'ড়ে! হাতি
ঘা'ল হবে ফেরু-ঘায়?
ঐ ঝন-নন-নন রণ-ঝন-ঝন-ঝঞঝনা শোনা যায়!
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া নাকাড়ায়!
ঐ শের-নর হাঁকড়ায়–
ওরে আয়!
ছোড়ু মন-দুখ,
হোক্ কন্দুক
ঐ বন্দুক তোপ, সন্দক তোর প'ড়ে থাক্, স্পন্দুক বুক ঘায়!
নাচ্ তাতা থৈ থৈ তা থৈ থৈ-
থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই।
ওরে আয়!
কর্ কোরবান আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই!
ঐ দীন্ দীন্-রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!
শেল- গর্জন
করি তর্জন
হাঁকে, 'বর্জন নয় অর্জন' আজ, শির তোর চায় মা'য়!!
সব গৌরব যায় যায়;
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কড়া-নাকাড়ায়!
ওরে আয়!
ঐ কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে আয়
মুখ ঢাকিবি কি লজ্জায়?
হুর্ হুর্‌রে!

কত দূর রে
সেই পুর রে
যথা খুন-খোশ্-রোজ খেলে হর্‌রোজ দুশমন-খুনে ভাই!
সেই বীর-দেশে
চল্ বীর বেশে,
আজ মুক্ত দেশেরে মুক্ত দিতে রে বন্দীরা ঐ যায়।
ওরে আয়!
বল্ 'জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম', ভীরু যারা মার খায়!
নারী আমাদেরি শুনি' রণ-ভেরী হাসে খলখল, হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!
মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়,
মোরা সত্য-ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গা'য়।

ওরে আয়!
ঐ কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে আয়!
অব– রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকীব ফুকারি' যায়!
তোপ্ দ্রুম্ দ্রুম্ গান গায়!
ওরে আয়!
ঐ ঝনন রণন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মূরছায়!
হাঁকো হাইদর
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর ঘুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে ঘুর্ খায়!
ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি', সত্যেরে
দিবি জয়-টিকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কঞ্জুশী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।
মোরা দুর্মদ,
ভর্- পুর মদ
খাই ইশ্‌কের, ঘাত শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!
লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা!
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

শমশের– তরবারি। **খুন-খুবী**– রক্তোন্মত্ততা। **দিলীর**– সাহসী, নির্ভীক। **দিলাবার**– প্রাণবন্ত। **জিঞ্জির**– শিকল। **শের-বব্বর**– সিংহ। **শের-নর**– পুরুষ সিংহ। **হাঁকড়ায়**– গর্জন করছে। **কোরবান্**– উৎসর্গ। **খুন–খোশ-রোজ**– রক্ত-মহোৎসব। **হররোজ**– প্রতিদিন। **আমামা**– শিরস্ত্রাণ। **নকীব**– তূর্যবাদক। **হাইদর**– মহাবীর হজরত আলী (রা.)-র হাঁক। **কঞ্জুসী**– কৃপণতা। **ইশকের**– প্রেমের।

সারসংক্ষেপ :

'রণ-ভেরী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ আশ্বিনের 'সাধনা' পত্রিকায়। কাবিতাটি গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা তুর্ক-গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্যে ভারত থেকে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনে রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক হিসেবে কবি 'রণ-ভেরী' কবিতায় সকলকে আহ্বান করে বলেছেন–

লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা!
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!!

সত্য ও ন্যায় যুদ্ধে যদি হত্যাও করতে হয় তাতে ভয় নেই। অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাজ। কাজেই দুশমনকে খুনে কোনো পাপ নেই। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে– স্বজাতির মুক্তি কামনায়– ন্যায়যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার মধ্যে যে গৌরব তা অন্য কোনো কাজে নেই। এজন্যে কবি সকলকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে কল্পনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রণ-ভেরী কোথা থেকে শোনা যায়?

ক. মহাসিন্ধুর পার হতে
খ. গ্রিসের ময়দান থেকে
গ. ভারতবর্ষ হতে
ঘ. জালিমের খুন থেকে

২. 'রণ-ভেরী' বলতে বোঝায়–

ক. সাজ সাজ রণ-সজ্জা
খ. সেনাদের আহাজারি
গ. পাণ্ডবদের খাণ্ডব দাহ
ঘ. যুদ্ধের তুর্যনিনাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শহিদ রুমি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে একজন বীর সেনানী। তিনি মনে করতেন অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাজ। কাজেই দুশমন খুনে কোনো পাপ নেই।

৩. উদ্দীপকের চেতনার সঙ্গে কোন চরণটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।
খ. ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়।
গ. মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা।
ঘ. তোড়ে শহীদের খুলি দুশমন পায় পায়।

৪. উদ্দীপক ও 'রণ–ভেরী' কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা–

i. মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা
ii. স্বজাতির মুক্তি
iii. জালিমের দাঙ্গা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'রণ-ভেরী' কবিতায় নারীরা কীভাবে রণে যায়?

ক. হাত-তালি দিয়ে　　খ. জয়-টিকা পরে

গ. গৈরিক বসন পরে　　ঘ. কড়া- নাকাড়া বাজিয়ে

৬. 'রণ-ভেরী' কবিতায় কবি আফসোস করেছেন কেন?

ক. মুসলিম যুবকেরা তরবারি হাতে নেয়ায়　　খ. মুসলিম যুবকেরা তরবারি হাতে না নেয়ায়

গ. গ্রিক সৈন্যরা আঙ্গোরা দখল করায়　　ঘ. গ্রিক সৈন্যরা আঙ্গোরা দখল না করায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কিন্তু পঁচিশ মার্চ থেকে আমরা আর পাকিস্তানি নই। অতএব, এখন আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানিদের নিশ্চিহ্ন করাই হবে প্রধান কর্তব্য।

৭. উদ্দীপকের চেতনা 'রণ-ভেরী' কবিতার যে চরণে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. দিবি জয়-টিকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়।

খ. ঐ কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়।

গ. সেই বীর- দেশে চল্ বীর বেশে।

ঘ. তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই।

৮. উদ্দীপক ও 'রণ-ভেরী' কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–

i. দুশমনকে খুন

ii. অন্যায়ের প্রতিরোধ

iii. ভীরুর রণসজ্জা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii.　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

হয়তো এখন তার
ডান কাঁধ কামানের গোলায় ঝাঁঝরা,
বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা
তবুও বন্দুক হাতে এক লক্ষ্যে বসে আছে
ট্রেঞ্চের ভিতর।
গহর, আমরা শুধু
অফুরন্ত দিন গুনছি অগুনতি বছর।

ক. 'রণ-ভেরী' কোন ছন্দে রচিত কবিতা?

খ. কবি কেন বাঙালি মুসলমানকে তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেছেন?

গ. উদ্দীপকটি 'রণ-ভেরী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. "উদ্দীপক আর 'রণ-ভেরী' কবিতায় কবির চেতনা একই আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছে।"

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'রণ-ভেরী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ.

কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'ইসলাম রবি'কে রক্ষা করার জন্য বাঙালি মুসলমানকে তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেছেন।
কবির নিকট নিজ দেশের স্বাধীনতা যেমন কাম্য তেমনি অন্য দেশের স্বাধীনতা ধ্বংসকারী যুদ্ধও ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হয়। গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক সরকারের যে যুদ্ধ চলছিল সে যুদ্ধে তুর্কি বীর কামাল পাশাকে সহযোগিতা করার জন্য ভারতবর্ষ হতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রত্যাশা করা হয়। এই যুদ্ধে কামাল পাশার প্রত্যাশাকে পুরণ করতে কবি 'রণ–ভেরী' কবিতায় ভারতীয় মুসলমানকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কবি আশা করেছেন যুদ্ধে তুর্কিরা বিজয়ী হলে ইসলাম রবি রক্ষা পাবে এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

গ.

আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির দিক থেকে 'রণ-ভেরী' কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
যিনি দেশপ্রেমিক মানুষ তিনি অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণকারীর উপর ক্ষুব্ধ থাকেন। নিপীড়িত দেশের প্রয়োজনে তিনি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধে তার অবস্থান থাকে সীমানার উর্ধ্বে। মুক্তির চেতনায় তিনি হয়ে উঠেন দূরন্ত পথিক। তিনি বিশ্বাস করেন নিজ দেশের মতো অন্য দেশের জন্যও জীবন দেওয়ার মধ্যে সার্থকতা রয়েছে।
উদ্দীপকে গহর দেশপ্রেমে উন্মাদ একজন সাহসী যোদ্ধা। তার কাঁধ কামানের গোলায় ঝাঁঝরা আর বাঁ হাত ব্যান্ডেজে বাঁধা। মানুষ যেমন তার প্রিয়জনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, ঠিক তেমনি দেশ, দেশের মাটির জন্যও নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে। অমরত্ব লাভের সৌভাগ্য ঘটে তাদেরই। 'রণ-ভেরী' কবিতায়ও কবি বাঙালি মুসলিম যুবকদের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা কবির মতে সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধে যদি হত্যাও করতে হয় তাতে কোন পাপ নেই। অবিচারের বিরুদ্ধে মানব সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করাই মনুষ্যত্বের কাজ।

ঘ.

উদ্দীপক এবং 'রণ-ভেরী' কবিতায় কবির চেতনা একই আদর্শের বাণীবাহক।
মুক্তিকামী মানুষ দিগন্তের যে কোন প্রান্তে মুক্তির লড়াইয়ে সাড়া দিয়ে থাকেন। গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক সরকারের যে যুদ্ধ চলছিল সেই যুদ্ধে কামাল পাশাকে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক চাওয়া হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে কবি নজরুল সে প্রস্তাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করে কামাল পাশাকে এ যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিলেন।
উদ্দীপকের গহর একজন নির্ভীক যোদ্ধা। দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে আহত হয়। আহত হলেও সে মনে করে মাতৃভূমির সম্মান তাকে বাঁচাতে হবে। গহর এভাবে তার মুক্তির চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখে। 'রণ-ভেরী' কবিতায়ও কবি বলেছেন ন্যায় যুদ্ধে দুশমন খুনে কোনো পাপ নেই। দেশের জন্য, জাতির জন্য– স্বজাতির মুক্তি কামনায়- ন্যায় যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার মধ্যে গৌরব রয়েছে। কবির মতে এ রকম গৌরব আর অন্য কোন কাজে নেই। এ জন্য কবি সকলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
উদ্দীপক ও 'রণ-ভেরী' কবিতায় মুক্তির চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে যুদ্ধ তাতে দুশমনকেও খুন করা যায়। এ জন্য কবি সকলকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপক আর 'রণ-ভেরী' কবিতায় কবির চেতনা একই আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে

পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

ক. কবি যুবকদেরকে কার নামে জান কোরবান করতে পরামর্শ দিয়েছেন?
খ. 'মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।' –উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রণ-ভেরী' কবিতার অমিলগুলো তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকে 'রণ-ভেরী' কবিতায় বর্ণিত যুদ্ধের চেতনা অনুরণিত হয়নি।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. খ

“শাত্-ইল্-আরব”

ভূমিকা

‘শাতিল-আরব’ নামক ইরানের একটি নদীকে স্মরণ করে কাজী নজরুল ইসলাম এই কবিতাটি রচনা করেছেন। ইসলামের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে কবি যুবসমাজকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের ‘শাত্-ইল-আরব’ কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইরাককে অবলম্বন করে স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানি মিস্‌রি আরবি কেনানি;–
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা-শির!
নাঙ্গা-শির!–
শম্‌শের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

‘কূত-আমার’র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া;
উগারি’ সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব ‘মস্তানী’র
ত্রস্তা-নীর
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত, –‘শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর!’
দজলা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক্ আজমে করেছে ধন্যা–
বীরপ্রসূ দেশ হ’ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমীর!
মর্দ বীর
শাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

দুশমন লোহু ঈর্ষায় নীল

তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর–
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর
খঞ্জরীর

খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
ইরাক্-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার।" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর–
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

শাতিল-আরব– আরব দেশের এক নদীর নাম। **দিলীর–** আসম সাহসী। **য়ুনানী–** য়ুনান দেশের অধিবাসী। **মিসরি–** মিসরের অধিবাসী। **কেনানি–** কেনানের অধিবাসী। **চাঙ্গা–** টাট্‌কা। **কূত্ আমারা–** কুতল-আমারা নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেণ্ড বন্দী হন। **দজ্‌লা–** টাইগ্রিস নদী। **ফোরাত–** ইউফ্রেটিস। **মর্দমী–** পৌরুষ। **ইরাক আজম–** মেসোপটিমিয়া। **জিন্দা–** জীবন্ত।

সারসংক্ষেপ :

'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি ১৩২৭ সালের (১৯২০) জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নজরুলের কবি-মানসের একটি বিশেষ রূপ উন্মোচিত হয়েছে এ কবিতায়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন নজরুলের কবি-মানসে যে গভীর ছায়াপতে করেছিলো তার ফলেই এ কবিতাটি রচনার উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কবি। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার অভিপ্রায়ে নজরুল হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-তমদ্দুনের সমন্বয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায়।
কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার চিত্র পরিচয়ে লেখা ছিল–

"টাইগ্রীস (দজলা) আর ইউফ্রিটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে শাত-ইল-আরব নাম নিয়েছে। তারপর বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু তিন মাইল করে চওড়া খর্জ-কুঞ্জ; তাতে ছোট ছোট নহর তারই কূলে আঙুর লতার বিতান, বেদানা নাশপাতির কেয়ারী। এখানে এলেই অনেক পুরোনো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছে করে–

শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।"

আরবের বর্তমান দুরবস্থার কথা জেনে তিনি সে দেশের গৌরবময় অতীতরূপের ধ্যান করেছেন। এই সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের পরাধীনতার কথাও মনে হয়েছে। বলা যায়, কবি স্বদেশের দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত বলেই আরবের বর্তমান দৈন্য ও ব্যথাকে অনুভব করতে পেরেছেন। কবি ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে (49^{th} Bengalis Regiment) যোগদান করে করাচি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরবের বেদনায় ব্যথিত হয়ে কবি তার শৌর্যবীর্যকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। এ কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্য প্রীতির সমন্বয় সাধন। এই কবিতায় কবি যেকোনো মুক্তিযুদ্ধেরই সৈনিক। হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতি সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

ইরাক্-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার।" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর–
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

শাত-ইল-আরব -এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' গানটির অনুরণন সুস্পষ্ট। কবি বায়বনের একটি কবিতার সঙ্গে এই কবিতার ভাবের অনেক মিল রয়েছে। স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও ঐতিহ্যপ্রীতিতে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের একাত্মতা লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শাতিল্-আরব কাকে বলা হয়েছে?

ক. আরবের নদীকে
খ. মিশরের পর্বতকে
গ. য়ুনানের নদীকে
ঘ. কেনানের সমুদ্রকে

২. 'মুক্ত আজাদ বেদুইন' হচ্ছে–

ক. মুক্ত জীবনের প্রতীক
খ. শহিদের লোহু
গ. জিন্দা বীর
ঘ. লোহিত বন্যা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভাণ্ডারে নজরুলের বিচরণ মূলত ধর্মীয় সূত্রে। তবে তিনি ধর্মীয় আবহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য জগতে প্রবেশ করেননি। মুসলিম সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যে উঁকি দিয়ে তিনি এখানকার বাঙালি জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

৩. উদ্দীপক ও 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ–

ক. মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গায়।
খ. লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনদের চাঙ্গা শির।
গ. পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার।
ঘ. ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল।

৪. 'শাত্-ইল্-আরব' ও উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ যে বিষয়ে–

i. নতুন জীবন জিজ্ঞাসায়
ii. পুরাতন জীবনকে ধারণে
iii. মূল্যবোধকে অস্বীকারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. দজলাকে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

ক. লোহুর দরিয়া
খ. নীল খুন
গ. ইরাক আজম
ঘ. আরব-বীর

৬. শাতিল-আরব পবিত্র নদী কেন?

ক. শহিদের রক্তে প্লাবিত
খ. জননীর দুঃখে কাতর
গ. তরঙ্গ ঝিলমিল করে
ঘ. ললাটে ভাস্বর টিকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন। তাঁর রচনায় হিন্দু পুরাণের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাও মীর-মানসে ব্যক্ত হয়েছে।

৭. উদ্দীপকের চেতনা কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার।
খ. আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার।
গ. জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়।
ঘ. গর্জ্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,-'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর।'

৮. উদ্দীপক ও 'শাতিল-আরব' কবিতাটি যে বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ–

i. হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণের ব্যবহার
ii. হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব
iii. হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি পল্টনের সৈনিক হিসাবে করাচি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সে সময়ে দেখা মধ্যপ্রাচ্যের দূরবস্থা নজরুলকে উদ্বেলিত করেছিল। তাই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের গৌরবময় অতীত রূপকে ধ্যান করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর বাংলার পরাধীনতার কথাও মনে হয়েছে। বস্তুত কবি স্বদেশের দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মধ্যপ্রাচ্যের দীনতা তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। অবশ্য কবি তাঁর শৌর্যবীর্যকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। বস্তুত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যপ্রীতি নজরুল-কবিমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ক. শাতিল-আরবের বন্যায় কোন দেশ ধন্য হয়?
খ. 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায় কোন কোন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে?
গ. 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "শাত্-ইল্-আরব' কবিতা ও উদ্দীপকের চেতনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'শাতিল্-আরবে'র বন্যায় ইরাক দেশ ধন্য হয়।

খ.

'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জাতীয় জাগরণ ছিল তাঁর বিশেষ অভিপ্রায়। জাতীয় জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরানো এবং আত্মশক্তি অর্জন করা। এর মধ্যে একটি জাতির মুক্তির মূলমন্ত্র নিহিত থাকে। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় কবি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের জাগ্রত চেয়েছেন।

গ.

সংস্কৃতির সমন্বয়ে 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যে বসরার অদূরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী সমন্বিত হয়ে শাতিল-আরব নাম নিয়েছে। অতঃপর বসরার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এই শাত-ইল -আরবের পাড়ে অনেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন সময়ে ভূ-খণ্ডের দখল নিয়ে যুদ্ধ করেছে। শাতিল-আরবের তীরে স্বাধীনতার লড়াই নজরুল কবি-মানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাঙালি পল্টনের সৈনিক হিসাবে করাচি গমন করেন। সে সময়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত হন। সে সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের দূরবস্থা নজরুলকে ব্যাকুল করেছিল। একই সঙ্গে তাঁর বাংলার পরাধীনতার কথাও মনে পড়েছে। এভাবে নজরুল মানসে বাংলা ও মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। অন্যদিকে 'শাত-ইল-আরব' কবিতায়ও নজরুলের সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম-তমদ্দুনের সমন্বয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই বলা যায়, সংস্কৃতির সমন্বয়ে 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

'শাত্-ইল্-আরব' কবিতা এবং উদ্দীপকের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যপ্রীতি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

শাতিল-আরবের তীরে যুগে যুগে য়ুনানি, তুর্কি, মিসরি আর দুর্ধর্ষ আরব সেনারা যুদ্ধ করেছে। অযুত যোদ্ধার বিপুল রক্ত ধারণ করে এ নদীর পানি ধন্য হয়েছে। কবি নজরুল আরবের এ গৌরবময় অতীত রূপকে ধ্যান করেছেন। অন্যদিকে তিনি আরবের বর্তমান দুরবস্থার কথা ভেবে বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন। কবি স্বদেশের দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত বলেই আরবের বর্তমান দৈন্য ও ব্যথা তাকে পীড়িত করেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সৈনিক জীবনে করাচি বাসের সূত্রে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সে সময়ে দেখা মধ্যপ্রাচ্যের দুরবস্থা নজরুলকে পীড়িত করেছিল। 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায়ও কবি আরবের বেদনায় অস্থির হয়েছেন। আরবের শৌর্যবীর্যকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। কবিতাটিতে কবির স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও ঐতিহ্যপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া কবি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন নজরুল চিত্তে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উদ্দীপক ও 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতায় স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও ঐতিহ্যপ্রীতির আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের আশাও তাতে ব্যক্ত হয়েছে। আলোচনা শেষে বলা যায়, 'শাত্-ইল্-আরব' কবিতা এবং উদ্দীপকের চেতনায় স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও ঐতিহ্যপ্রীতি সম ভাবধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র-ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

ক. শাতিল-আরবের তীরে কাদের টাটকা শির লুট হয়েছে?
খ. শাতিল-আরবের তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয় দিন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'শাত্-ইল্- আরব' কবিতার কোন দিক থেকে অমিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "শাত্-ইল্-আরব' কবিতায় উদ্দীপকের চেতনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ

খেয়া-পারের তরণী

ভূমিকা

'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় নজরুল অধ্যাত্মশক্তির মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের পথে থাকলে মানবজীবনে যে কোনো বিপদ আসে না, সে কথাই এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি তরুণ সমাজকে ধর্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- নজরুলের কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইসলাম ধর্মের অধ্যাত্ম বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে।
নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ।
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী!
দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

লংঘি' এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে–
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কাণ্ডারী আহ্মদ, তরী ভরা পাথেয়!

আবুবকর উস্মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান– লা শরীক আল্লাহ্!

'শাফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আহমদ– মোহাম্মদ (স.)। **লা শরীক আল্লাহ**– আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই। **জান্নাত**– বেহেশত, স্বর্গ। **শাফায়াত**– পরিত্রাণ। **দেয়া**– বর্ষা। **রুদ্র**– শিব। **জলধি**– সমুদ্র। **ভৈরব**– ভয়ংকর, শিবের গর্জনের মতো বিশাল শব্দ। **কাণ্ডারী**– নৌকা বাহক।

সারসংক্ষেপ :

'খেয়া–পারের তরণী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। কবিতাটি প্রকাশের কিছুদিন পরেই মোহিতলাল মজুমদার 'খেয়া–পারের তরণী' কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন–

> "কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়া–পারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুরসৃষ্টি করিয়াছে, ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে– কোনখানে আসন অধিকারের সীমালঙ্ঘন করে নাই –এই প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনোখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবলমাত্র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব, –
>
> আবু বকর উসমান উমর আলী হাইদর
> দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
> কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
> দাঁড়িমুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ্!
>
> এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর, গম্ভীর ধ্বনি। আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ভস্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে;– বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ কাব্য– লা শরীক আল্লাহ্ – যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

'খেয়া–পারের তরণী' কবিতাটি রচনার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ঢাকার নবাব পরিবারের মেহের বানু খানম নামে এক মহিলা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশের জন্যে একটি ছবি পাঠান। ইনি ঢাকার স্যার নবাব আহ্সান উল্লাহ বাহাদুরের কন্যা এবং স্যার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের ভগিনী। ছবির ভাবটি ছিল– তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলধি-বক্ষে একটি তরণী এগিয়ে চলেছে। তরণীটির চারটি দাঁড় ও একটি হাল। চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবি হরফে লেখা– আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী। এরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের চারজন মহামান্য খলিফা, পরে হযরতের 'আসহাব' নামে পরিচিত। হালের

মাথায় ও পালের মধ্যে যথাক্রমে হজরত মহম্মদের নাম ও শাফায়াৎ লেখা ছিল। এই ছবিটির কোনো নাম ছিল না। এই ছবিটিকে উপলক্ষ করেই নজরুল 'খেয়া–পারের তরণী' রচনা করেন। ছবিটি 'মোসলেম ভারত'-এর গোড়ায় ছাপা হয়। তার আখ্যা (Caption) হিসেবে লেখা হয়–

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধুও দেয়া ভার,
ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় তরীটির পালে কী লেখা ছিল?

ক. কাণ্ডারী　　খ. জান্নাত
গ. শাফায়াত　　ঘ. প্রলয়

২. রাত্রে খেয়া পারের আশা করা যায়নি কেন?

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগে　　খ. মৃত্যুর মহানিশায়
গ. প্রলয়ের ভয়ে　　ঘ. ভৈরব গর্জনে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করা হয়, রোজ কেয়ামতে হাশরের ময়দানে আল্লাহ মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন। মানুষ পৃথিবীর কর্মফল অনুযায়ী সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। হাশরের ময়দানে কেবল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.)-এর সুপারিশ কার্যকরী হবে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. কামাল পাশা　　খ. রণভেরী
গ. খেয়া পারের তরণী　　ঘ. আগমনী

৪. উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ যে কারণে–

i. ইসলামি ঐতিহ্য ব্যবহারে
ii. পুরাণ ব্যবহারে
iii. পুরাণ ও সংস্কৃতির মিশ্রণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় ত্রাসে কারা কাঁপছিল?

ক. সিন্ধু　　খ. যাত্রীরা
গ. মাঝি　　ঘ. রুদ্র

৬. 'শাফায়াত' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. পারলৌকিক পরিত্রাণ　　খ. মৃত্যুর মহানিশা
গ. বজ্র-নিপাত　　ঘ. জলধির গর্জন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মিলবে সেথাই আসল শরাব
তন্বী হুরী ডাগর-আঁখি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে যে চরণের–

ক. 'শাফায়ত'-পাল বাঁধা তরণীর মাস্তুল　　খ. আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর

গ. 'জান্নাত' হতে ফেলে হুরী রাশ রাশ ফুল।　　ঘ. খঞ্জর মারো আজ গর্দ্দানেই

৮. উদ্দীপক ও 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় মিল যে বিষয়ে–

i. রূপক ব্যবহারে

ii. ছন্দ প্রয়োগে

iii. প্রতীকী অর্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

যে কবিতায় কোনো গল্প বা কাহিনির মধ্য দিয়ে অন্য কোনো বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত করা হয়, তাকে আমরা রূপক কবিতা বলি। রূপক কবিতা সাধারণত আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক এই কয় প্রকারের হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন ঠাকুরের 'স্বপ্নপূরাণ', যতীন সেনের 'ভারতী', মোহিত লাল মজুমদারের 'আহ্বান' যথাক্রমে আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক রূপক কবিতা হিসাবে পরিচিত। কবিতার আখ্যানভাগ বা গল্পাংশ স্বল্প হলে এবং বিষয়বস্তু যদি বিষয়াতীত অন্য কোনো ভাবকল্পনাকে ব্যঞ্জিত করে, তবে সেই শ্রেণির কবিতাকে রূপক না বলে আমরা সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী কবিতা বলতে পারি।

ক. 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় তরীর কাণ্ডারী কে?

খ. 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতা অবলম্বনে কিয়ামত রাত্রির বর্ণনা দিন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "খেয়া-পারের তরণী' একটি সার্থক রূপক কবিতা।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় তরীর কাণ্ডারী হচ্ছেন আহমদ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (স.)।

খ.

'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় সমস্যা-সঙ্কুল ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কবিতায় বর্ণিত হয়েছে কিয়ামত রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়। এ রাত্রিতে যাত্রীরা খেয়া পার হতে এসেছে। এ সময়ে সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গে নাচে। থমকে থমকে বিশ্ব কেঁপে উঠে। কখনো কখনো শিঙ্গার ঘন হুঙ্কার শোনা যায়। মৃত্যু যেন রুদ্রের মতো উলঙ্গ রূপ ধারণ করে নেচে বেড়ায়। মহাবিশ্ব প্রলয়ে কেঁপে উঠে। অবস্থাদৃষ্টে ভয়ে কাঁপে তরীতে অবস্থানরত খেয়া পার হতে আসা যাত্রীরা। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই পূণ্য পথের যাত্রীরা নির্বিঘ্নে খেয়া পার হয়ে চলে যায়।

গ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় রূপক অর্থে প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে মানুষের পার্থিব জীবন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-সংকুল। সে জীবন উত্তরণে সক্ষম কেবল পুণ্যপথের যাত্রীরা। পার্থিব জীবনের বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্র পারাপারের ক্ষমতা কেবল ইসলামের আছে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বে চার খলিফার সহায়তায় পুণ্যবান যাত্রীরা ইসলাম রূপ তরীতে চড়ে ভয়ার্ত সমুদ্র নিঃসঙ্কোচে পার হয়ে যেতে সক্ষম হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে কাহিনির মধ্যে কোনো বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত থাকলে সেটা হয় রূপক কবিতা। সাহিত্যে রূপকের ব্যবহার বিশেষ আবহ সৃষ্টি করে। কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটিও একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ

করে। কবিতায় ইসলাম ধর্মকে তরীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মরূপ তরীর কর্ণধার হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (স.) এবং এ তরীর দক্ষ দাঁড়িরা হলেন ইসলামের চার খলিফা–আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলি (রা.)। তাঁরা মুখে 'লা শরিক আল্লাহ' উচ্চারণ করতে করতে হযরতের নেতৃত্বে সমস্যাসঙ্কুল সমুদ্র অর্থাৎ পুলসেরাত পাড়ি দিতে সক্ষম হন। এভাবে কবিতাটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, উদ্দীপকের মূলভাব সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ.

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় রূপকের ব্যবহার সার্থকতা লাভ করেছে।

সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ একটি প্রসিদ্ধ শিল্পপ্রকৌশল। সাধারণত যে কবিতায় কোন কাহিনির মধ্য দিয়ে অন্য কোন বিশেষ অর্থের ইঙ্গিত করা হয় তখন তাকে রূপক কবিতা বলা হয়। রূপক কবিতা সাহিত্যে যেমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তেমনি লেখকের মানস-বৈশিষ্ট্য প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটিও একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। বিশেষ অর্থটি হচ্ছে যারা পুণ্যবান তারা এই খেয়ায় পার হতে পারবেন– কিন্তু যারা পাপী-তাপী তাদের নৌকা ওপারে যাবে না। নৌকার কাণ্ডারি হিসাবে থাকবেন স্বয়ং হযরত মুহম্মদ (স.) এবং চার খলিফা আবু বকর (রা.), উসমান (রা.), উমর (রা.) এবং আলী (রা.) হবেন সেই নৌকার দাঁড়ি। অর্থাৎ ইসলামের পাঞ্জেগানা যে মুমিন মুসলমান মেনে চলবেন পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই, কেননা তাঁদের সঙ্গে থাকবেন চার খলিফা এবং নবিজি স্বয়ং।

ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ চেতনাকে কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। কবিতায় কবি সরাসরি মূল বক্তব্যে প্রবেশ না করে কিছু উপমা ও শব্দকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে এটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাই বলা যায়, খেয়া-পারের তরণী একটি সার্থক রূপক কবিতা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

একটি দেশ আছে, যে দেশ নদীমাতৃক ও কুসুমসুরভিত। এ দেশের মানুষ মনে করে স্বর্গে মন্দাকিনী কলনাদে প্রবাহিত, বিবিধ কুসুম ধারে ধারে প্রস্ফুটিত। অব্যাহত শান্তিতে গোলকধাম শীতলিত। শ্লথবৃন্ত রাশি রাশি কুসুম ভূপতিত হইয়া কোমল তৃণশয্যার উপর অপূর্ব কুসুমাস্তরণ সৃষ্টি করিতেছে। অযুত অপ্সরা গীতি-কাকলি মুখরিত মঞ্জুরীবীথিকায় অপূর্ব নর্তনে ক্রীড়া করিতেছে।

ক. 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতায় রাত্রিতে কারা এসেছিল?

খ. 'খেয়া-পারের তরণী' একটি রূপক কবিতা।' –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

গ. উদ্দীপকটি 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. "খেয়া-পারের তরণী' কবিতার স্বর্গের প্রতিচিত্র উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. গ ৮. ক

কোরবানী

ভূমিকা

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ত্যাগধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'কোরবানী' কবিতা। তরুণ সমাজকে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো ত্যাগধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবমুক্তির সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। বিদ্রোহের জন্য তরুণ সমাজের আত্মত্যাগ যে কত জরুরি, এ কবিতা পাঠে তা উপলব্ধি করা যায়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'কোরবানী' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়ণে নজরুল ইসলামের চেতনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- কোরবানির ত্যাগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খাম্‌কা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর বাণীর,–
আজিকার এ খুন কোর্‌বানীর!
দুম্বা-শির রুম্‌-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি! –রহমান কি রুদ্র নন?
ব্যস! চুপ খামোশ রোদন!
আজ শোর ওঠে জোর, "খুন দে, জান্‌ দে, শির দে, বৎস" শোন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
খঞ্জর মারো গর্দানেই,
পঞ্জরে আজি দর্‌দ্‌ নেই,
মর্দানী'ই পর্দা নেই,
ডর্‌তা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন!
খুনে খেলবো খুন-মাতন!
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুঝবো রণ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
চ'ড়েছে খুন আজ দুনিয়ারার
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার!
'জুলফেকার' খুলবে তার
দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে-পূত-বদন।

খুনে আজকে রুধবো মন।
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদী মেলে না পস্তানো'য়
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!
হত্যা নয় কি মৃত্যুও? তবে রক্ত-লুব্ধ কোন্
কাঁদে– শক্তি-সুস্থ শোন্–
"এয় ইব্‌রাহীম্ আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!"
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এ তো নহে লোহু তরবারের
ঘাতক জালিম জোরবারের!
কোরবানের জোর-জানের
খুন এ যে, এতে গোর্দা ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন!
এতে মা রাখে পুত্র পণ!
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে' খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইব্‌রাহীম্ সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্‌লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দ্যাখ্ কেঁপেছে 'আরশ' আস্‌মানে
মন-খুনী কি রে রাশ মানে?
ত্রাস প্রাণে? তবে রাস্তা নে!
প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে বাজাবে কোন্ বোধন?
সে কি সৃষ্টি-সংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন!–
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
মুস্‌লিম রণ-ডঙ্কা সে,

খুন দেখে করে শঙ্কা কে?
টঙ্কারে অসি-ঝঙ্কারে,
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি' গড়া ভীম কারা ল'ড়বো রণ-মরণ!
ঢালে বাজ্‌বে ঝন্‌-ঝনন।
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
জোর চাই, আর যাচ্‌না নয়,
কোরবানী-দিন আজ না ওই?
বাজনা কই? সাজ্‌না কই?
কাজ না আজিকে জান্‌ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধারণ?
বল্‌– "ঝুঝবো জান্‌ ভি পণ?"
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান্‌ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

রহমান– করুণাময়। **খামোশ**– নীরব। **গর্দানে**– স্কন্ধে। **জুলফেকার**– মহাবীর হজরত আলী (রা.)-এর বিশ্বত্রাস তরবারি। **শেরে-খোদা**– খোদার সিংহ; হযরত আলিকে এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত করা হয়। **জোরবার**– বলদৃপ্ত। **জোরবান**– মহাপ্রাণ। **আজাদী**– মুক্তি। **হাজেরা**– হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্ত্রী। **আরশ**– খোদার সিংহাসন। **যুঝবো**– যুদ্ধ করবো। **পূত**– পবিত্র। **ডম্বরু**– শিবের বাদ্যযন্ত্র। **জল্লাদ**–হত্যাকারী। **বিষাণ**– পশুর শিং দিয়ে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। **কিয়ামত**– প্রলয়, ধ্বংস।

সারসংক্ষেপ :

'কোরবানী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। কবিতাটির একটি জন্মবৃত্তান্ত আছে। তরীকুল আলম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কোরবানিকে বর্বরযুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সময়েই নব্যতুর্কিরা স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে জান কোরবান দিচ্ছিল। তখন নজরুল এই 'কোরবানী' কবিতাটি লিখে প্রচণ্ডভাবে এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেন।

কোরবানি ইসলাম ধর্মের মুসলমানদের জন্যে একটা বিশেষ ধর্মীয় প্রথা। কোরবানি অর্থ ত্যাগ বা বিসর্জন। আল্লাহ তায়ালার রাহে ত্যাগ বা বিসর্জন দেয়ার নাম কোরবানি। এই ত্যাগ দেশের জন্যে মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে কোরবান করতে হয়। নব্যতুর্কিরা স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে যেভাবে জান কোরবান করছিল নজরুল ইসলাম সেই স্বাধীনতাকামী মানুষের যুদ্ধকে কোরবানি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইসলামের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী যাঁদের সামর্থ আছে সচ্ছলতা আছে তাদের জন্যে কোরবানি করা জায়েজ। এই কোরবানি সুদূর অতীতে প্রবর্তন হয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে স্বপ্নে তাঁর প্রিয়বস্তুকে কোরবানি করতে বলা হয়। ইব্রাহিম (আ.) পরের দিন একটি দুম্বা কোরবানি করেন। কিন্তু দেখা গেল রাতে পুনরায় তাকে স্বপ্নে একই কথা বলা হলো– তখন তিনি একটি উট কোরবানি দিলেন কিন্তু তৃতীয় রাতেও যখন তাকে স্বপ্নে একই কথা বলা হলো তখন তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন- সবচাইতে প্রিয় বস্তু কী? নিশ্চয় সন্তান। তখন তিনি নিজ সন্তান ইসমাইলকে (আ.) মিনা ময়দানে নিয়ে গিয়ে কোরবানি করতে যেই উদ্যত হলেন তখন তাঁর উপর নির্দেশ এলো যে, তার কোরবানি কবুল হয়েছে। পুত্রকে আর

জবাই করতে হবে না। এর পরিবর্তে একটা দুম্বা জবাই করলেই চলবে। এর পর থেকে ইসলামে কোরবানি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হিসেবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পবিত্র কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'শেরে- খোদা' কাকে বলা হয়েছে?

ক. হজরত আলি (রা.) খ. হজরত ইব্রাহিম (আ.)
গ. হজরত ইসমাইল (আ.) ঘ. বিবি হাজেরা (রা.)

২. মা হাজেরা কেন তাঁর ছেলেকে 'বলির পূত বসন' পরিয়েছেন?

ক. ঘাতক জালিমকে রুখতে খ. ত্যাগের পথে উৎসর্গ করতে
গ. স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রয়াসে ঘ. রণ-ডঙ্কা বাজাতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

খাজা তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই–
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।

৩. উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতার যে চরণ সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন। খ. জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর।
গ. যারা ছিল দুর্দ্দম আজ তারা দিক্‌দার। ঘ. মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো।

৪. উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা–

i. শৃঙ্খল
ii. দাসত্ব
iii. মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'কোরবানী' কবিতায় কোথায় 'আরশ' কেঁপেছে?

ক. আসমানে খ. পাতালে
গ. মীনায় ঘ. সত্যাগ্রহে

৬. 'সত্যাগ্রহ' বলতে বোঝায়–

ক. মানবের ক্ষুব্ধ মন খ. আজাদির উদ্দেশ্যে লড়াই
গ. সত্যরক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘ. রক্তে পূত বদন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কোরবানী হচ্ছে ত্যাগ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ তাই কোরবানী। হজরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের শ্রেষ্ঠ সন্তান হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে কাজী নজরুল ইসলামও চেয়েছেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আত্মত্যাগ করবেন।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে যে চরণ সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন। খ. ঘরে যত দুশমন, পরে কেন হানো মার।
গ. ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন। ঘ. আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে।

৮. উদ্দীপক ও 'কোরবানী' প্রকাশিত হয়েছে–

i. ত্যাগের মাহাত্ম্য
ii. প্রাপ্তির প্রত্যাশা
iii. স্বাধীনতা হরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

খেয়ে খেয়ে গোশত রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসী বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানী।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই।

ক. হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কোথায় কোরবানি করা হয়েছিল?
খ. 'কোরবানী' কবিতায় কবি সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'কোরবানী' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "ত্যাগের মাধ্যমেই মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করা যায়।" –উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.
হযরত ইসমাইল (আ.)-কে মদিনার ময়দানে কোরবানি করা হয়েছিল।

খ.
'কোরবানী' কবিতায় কবি একটি স্বাধীন ও সুন্দর দেশ গড়ার জন্য সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে বলেছেন।
ইসলামের ইতিহাসে কোরবানির একটি গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ.) ধর্মের জন্য, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নিজ পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি দিয়েছিলেন। কবির মতে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) যদি ধর্মে অনুরক্ত হয়ে নিজ পুত্রকে কোরবানি দিতে পারেন তবে বাঙালি মুসলমান সমাজ কেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাদের পূর্বপুরুষের মতো আত্মোৎসর্গ করতে পারবে না। কবি এ কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান সমাজকে জেগে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

গ.
আত্মত্যাগের বিষয়ে উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।
কোরবানী ইসলাম ধর্মের একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ। এর পারিভাষিক অর্থ ত্যাগ। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হযরত ইব্রাহিম (আ.) প্রিয়পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রিয় বান্দার এই ত্যাগে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর এই ত্যাগ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
ইসলামের ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কোরবানি হল ত্যাগ বা বিসর্জন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্যাগ বা বিসর্জন দেয়া হচ্ছে কোরবানি। 'কোরবানী' কবিতায় এই ত্যাগ দেশের জন্যে এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্যও করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। কবিতায় নব্যতুর্কিরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যেভাবে অকাতরে প্রাণ বলিদান করছিল সেই স্বাধীনতাকামী মানুষদের যুদ্ধকে কবি কোরবানি বলে আখ্যা দিয়েছেন। উদ্দীপকেও নিজেকে কোরবানির আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে এতে

দীন বাঁচবে। ইসলাম দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হবে। বলা যায়, আত্মত্যাগের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

ঘ.

'ত্যাগের মাধ্যমেই মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করা যায়।'- মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী 'কোরবানী' আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল মাইল ফলক। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ.) প্রিয়পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি দিয়েছিলেন। সেই থেকে মুসলিম সমাজে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে ত্যাগের কারণে পশু কোরবানির প্রথা প্রচলিত হয়েছে। নজরুল মানসে মুসলিম সমাজের এই আত্মোৎসর্গের প্রথা ধর্মের বাইরেও রাজনৈতিক চেতনায় উপনীত হয়েছে।

'কোরবানী' কবিতায় বলা হয়েছে ইসলামে কোরবানির মতো গৌরবময় আত্মবিসর্জনের ইতিহাস রয়েছে। কবি ইসলাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান সমাজকে জেগে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ইব্রাহিম (আ.) যদি তাঁর পুত্রকে বিসর্জন দিতে পারেন তবে কেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মুসলমানরা পূর্বপুরুষের মত আত্মোৎসর্গ করতে পারবে না। কবি আরও বলেছেন আজ ন্যায়ের জন্য, দেশ-জাতির জন্য ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে। উদ্দীপকের চরিত্র কামালও সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন নিজেকে কোরবানি দিতে। গোশত-রুটি খেয়ে কেবল খোদার খাসি হওয়া যাবে। ইসলামকে স্বাধীন করতে হলে নিজের জানকে কোরবানি করতে হবে।

'কোরবানী' কবিতা ও উদ্দীপকে নিজেকে উৎসর্গের জয়গান গাওয়া হয়েছে। বাঙালি মুসলমান যদি এদেশের শকুন–শোষকদের বিরুদ্ধে খুনিয়ারার মতো রুখে দাঁড়ায় তাহলে একদিন একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে। তাই বলা যায়, 'ত্যাগের মাধ্যমেই মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করা যায়।' –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহ বংশ– রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

ক. 'জুলফেকার' কাকে বলা হয়?

খ. 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'কোরবানী' কবিতাকে কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'কোরবানী' কবিতার মর্মবাণী একসুরে অনুরণিত হয়নি।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক

মোহর্‌রম

ভূমিকা

কারবালার ফোরাত নদীর তীরে নির্মম ঘটনার আলোকে রচিত হয়েছে 'মোহর্‌রম' কবিতা। কবি মুসলিম শক্তির হৃত গৌরব এবং লাঞ্ছিত সম্মানকে পুনরুদ্ধারের মানসে এ কবিতা রচনা করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের 'মোহর্‌রম' কবিতাটি পাঠের পর আপনি–

- নজরুলের মুসলিম সমাজের ভীরুতা ও শঙ্কা দূর করার বিষয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবেন।
- কবির শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহ্বান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া,–
"আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে–
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"
'হায় হায় হোসেনা', ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তল্‌ওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায়!
উন্মাদ দুল্‌দুল্ ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায়!
মা ফাতেমা আস্‌মানে কাঁদে খুলি' কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেত বাস।
রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা;
মেহেদির রঙটুকু মুছে গেল সহসা!
'হায় হায়' কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা
'কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেল সকীনা!'
কাঁদে কে রে কোলে ক'রে কাসিমের কাটা-শির?
খান্ খান্ খুন হ'য়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর।
কেঁদে গেছে থামি' হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা!"
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস,
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশমনও 'সাব্বাস্'।

দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, শির দেগা, নেহি দেগা আমামা"।
কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খা খা করে কারবালা, নাই পানি খর্জুর।
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়ুপায়,
জিভ চুষে কচি জান্ থাকে কিরে ধড়ুটায়?
দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,
কাঁদে বানু– "পানি দাও, মরে জাদু আস্গর!"
পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা, –'পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্!"

পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে!
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
"দাদা! তেরি ঘর কিয়া বর্বাদ্ পয়মাল্!"

হাইদরী হাঁক হাঁকি' দুল্দুল্-আস্ওয়ার
শম্শের চম্কায় দুশমনে ত্রাসবার!
খ'সে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।
নিঃশেষ দুশমন্; ওকে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে' মোছে আখি-প্রান্ত!
কোথা বাবা আস্গর? শোকে বুক ঝাঁঝরা,
পানি দেখে' হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা!
ধুঁকে ম'লো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নি রে বাছাদের মুখে কম্জাতরা!
অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল ঝর্ঝর্,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!
হল্কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?–
আফ্তাব ছেয়ে নিল আধিয়ারা রাতিতে।
আস্মান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরহান হাতে, আহ্–
'আরশে'র পায়া ধ'রে কাঁদে মাতা ফাতেমা,
"এয় খোদা, বদ্লাতে বেটাদের রক্তের
মার্জনা করো গোনা পাপী কম্বখ্তের!"
কত মোহর্রম এলো, গেল চ'লে বহু কাল–
ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল!
মুস্লিম! তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন',
'ওয়া হোসেনা– ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মোহর্রম মাহিনা,–

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির,–
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুস্‌লিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হ'য়ে যাক্!
নওশার সাজ নাও খুন-খচা অস্তিন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন!
হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের,
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্!
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাসিমের মত দেবো জান্ রুধি' অন্যায়।
মোহর্‌রম! কারবালা! কাঁদো "হায় হোসেনা!"
দেখো মরু-সূর্য এ খুন যেন শোষে না!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

মাতম– ক্রন্দন, শোক। **লা'ল**– জাদু। **এজিদ**– হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী, নিষ্ঠুর শাসক। **কাশিম–** ইমাম হাসানের পুত্র। **দুলদুল**– ইমাম হোসেনের ঘোড়ার নাম। **নওশা**– বর। **সীমার**– হোসেনের হত্যাকারী। **ফাতিমা**– ইমাম হোসেনের ছোট মেয়ে। **আমামা**– শিরস্ত্রাণ। **বানু**– আসগরের মাতা। **আসগর**– ইমাম হোসেনের শিশুপুত্র। **বরবাদ**– নষ্ট। **পয়মাল**- ধ্বংস। **জয়নাল**– ইমাম হোসেনের পুত্র। **কমজাতরা**– নীচমনাগণ। **এক কাৎরা**– এক বিন্দু। **হলকুম**– কণ্ঠ। **তেগ**– তরবারি। **আফতাব**– সূর্য। **মর্সিয়া**– শোকগীতি। **শমশের**– তরবারি। **জহর**– বিষ। **কমবখ্‌ত**– হতভাগ্য। **কহর**– অভিশাপ। **দাদ**– প্রতিশোধ। **নকীব**– তূর্যবাদক।

সারসংক্ষেপ :

'মোহররম' কবিতাটি ১৩২৭ সালে, আশ্বিন সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে খেলাফৎ আন্দোলনের যুগে মুসলমান সমাজের লক্ষ্যহীন মানসিকতা। ছন্দের নৈপুণ্যে মর্মস্পর্শী ও আবেগদীপ্ত এ কবিতাটিকে ধর্মীয়-গীতি আখ্যা দেয়া যায়।

কবি এ কবিতায় মুসলমান সমাজকে আহ্বান করেছেন রক্তের মূল্যে তাদের হৃত গৌরব ও লাঞ্ছিত সম্মানকে পুনরুদ্ধার করতে।

ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,-
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির,-
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুস্‌লিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হ'য়ে যাক্‌!

কবিতাটি ১৩২৯ সালের ১২ই ভাদ্র সংখ্যা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মূলভাব প্রাণস্পর্শী ও আবেগোজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে 'ধূমকেতু'র মোহররম সংখ্যার নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে

"কোথায় কারবালার দুপুরে মাতম হাহাকার রবে ক্রন্দন করে ফিরছে। আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধু ধু সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়– আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়; তোমার অপমান জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে। ...ঐ শোনো কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে– "তৃষ্ণা, তৃষ্ণা"! কে দেবে এ তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ তৃষ্ণা আব-জমজম আবে কওসরেও মিটাবার নয়। এ কারবালার মরুদগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল মুসলিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছে অরুণ খুনের তরুণ শহিদ মুসলিম, কাসেমের এ তৃষ্ণা মেটাবে? ঐ শোন সদ্য স্বামীহারা বালিকা সখিনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কাসেমের মতো প্রাণ বলিদান।"

কবিতাটির ভাব-বিষয়বস্তু, ছন্দ, ভাষা-অলঙ্কার সমন্বয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইতিহাসের বিষয় যখন কবিতার বিষয় হয় তখন তা কতটা মর্মস্পর্শী হতে পারে তা এ কবিতাটি না পড়লে জানা যেতো না। সার্থক এ কবিতাটির শৈলীর ক্ষেত্রে কবি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। ফলে কবিতাটি সার্থকতার স্বর্ণশিখর স্পর্শ করতে পেরেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কার ঘোড়াকে দুলদুল বলা হত?

ক. ইমাম হোসেন
খ. সীমার
গ. কাসেম
ঘ. ফাতিমা

২. 'মর্সিয়া' বলতে বোঝায়–

ক. শোক গীতিকা
খ. তূর্যবাদক
গ. আবেগদীপ্ত কবিতা
ঘ. প্রতিশোধ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'মেঘনাদবধ কাব্যে' 'রামায়ণে'র কাহিনি নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। মধুসূদনের দৃষ্টিতে রাম হয়েছেন পররাজ্য গ্রাসকারী অপশক্তি আর রাবণ হয়েছেন প্রজাবৎসল ও দেশপ্রেমিক রাজা।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. আগমনী
খ. বিদ্রোহী
গ. মোহর্‌রম
ঘ. কামাল পাশা

৪. উদ্দীপক ও 'মোহর্‌রম' কবিতার সাদৃশ্য–

i. চেতনাগত
ii. বিষয়গত
iii. আঙ্গিকগত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. iii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'আমামা' শব্দের অর্থ কী?

ক. ধ্বংস
খ. শিরস্ত্রাণ
গ. তরবারি
ঘ. সূর্য

৬. মহররম মাস এলে কবি কী করতে চেয়েছেন?

ক. শোক ভুলে শক্তি সঞ্চয় করবেন
খ. কারবালা প্রান্তরে কাঁদবেন
গ. দুলদুলে চড়বেন
ঘ. সীমারের বিপক্ষে লড়বেন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মহররম এক অর্থে শোককে শক্তিতে পরিণত করার শক্তি। ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এ ধরণের আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয় না। মহররমের এই শোকাবহ ঘটনা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের এক সময় দারুণভাবে উদ্দীপিত করেছে।

৭. নিচের কোন চরণটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের
খ. গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা
গ. ঐ হল পূণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।
ঘ. হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

৮. উদ্দীপক ও 'মোহর্‌রম' কবিতায় প্রকাশিত মোহর্‌মের রূপ–

i. শোক
ii. শক্তি
iii. আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

ব্যাকুল মানবকুল। অস্থির মেদিনী।
আকুল নির্জরবৃন্দ। স্বর্গ বিকম্পিত।
প্রলয়ের শিঙ্গা যেন বিশ্ব বিদারিয়া
সহসা উঠিল বাজি' নাশিতে এ সৃষ্টি।
হা হোসেন। হা হোসেন। হায়। হায়। হায়।
প্রতি অণু-পরমাণু লাগিল ঘোষিতে।

ক. 'মহর্‌রম' কবিতায় পানির জন্য কে গড়াগড়ি দেয়?
খ. কারবালার প্রান্তরে এজিদ বাহিনীর নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরুন।
গ. উদ্দীপকটি 'মোহর্‌রম' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি করুণ রসাত্মক হলেও 'মোহর্‌রম' কবিতায় বীররস সঞ্চারিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

'মহর্‌রম' কবিতায় ইমাম হোসেনের ছোট মেয়ে ফাতিমা তৃষ্ণার জলের জন্য গড়াগড়ি দেয়।

খ.

কারবালা প্রান্তরে এজিদ বাহিনী হযরত হোসেন (রা.) পরিবারের প্রতি নৃশংসতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল।

হযরত হোসেন (রা.) কুফায় ফিরে আসার পথে কারবালা প্রান্তরে পরিবারসহ এজিদ বাহিনীর হাতে আটকা পড়েন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর তীর দখল করে হোসেন বাহিনীর পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এজিদ নারী বা শিশু কাউকে জলের তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ দেয় না। হোসেন শিবিরে ফাতিমা নামে একটি কচি শিশু 'পানি, পানি' বলে আর্তচিৎকার করে। তার চিৎকারে কারবালা প্রান্তর প্রকম্পিত হলেও এজিদের মন এতটুকু গলেনি। এভাবে কারবালা প্রান্তরে নৃশংস এজিদের হাতে হযরত হোসেনের হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনি রচিত হয়।

গ.

মর্মভেদী কান্নায় উদ্দীপকটি 'মোহর্‌রম' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কারবালার ঘটনা মুসলিম মানসে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। কুফাবাসীর অনুরোধে হযরত ইমাম হোসেন (রা.) কুফায় ফিরে আসার পথে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে এজিদ বাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর তীর আটকে রেখে হোসেন বাহিনীকে পানীয় জলের সংকটে ফেলে। পানীয় জলের অভাবে হোসেন বাহিনীর অনেকেই ছটফট করে মারা যান। ট্র্যাজেডি নেমে আসে কারবালা প্রান্তরে।

এজিদের হাতে হযরত হোসেনের মৃত্যুর হৃদয়বিদারক কাহিনি 'মোহর্‌রম' কবিতার উপজীব্য। কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধে এজিদ ফোরাতকূল দখল করে হোসেন বাহিনীকে পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে হোসেন শিবিরের অনেকেই পানির অভাবে ছটফট করে মারা যায়। নিষ্ঠুর এজিদ নারী বা শিশু কাউকে তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগ দেয়নি। কচি মেয়ে ফাতিমা পানির অভাবে মারা গেছে। কিন্তু এজিদের পাষাণ হৃদয়ে তাতে এতটুকু আঁচ লাগেনি। সেদিন সাহারা প্রান্তরে পানির জন্য যে আর্ত চিৎকার উঠেছিল তাতে আকাশ-বাতাস পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। কবি-কল্পনায় কারবালা প্রান্তরে আজও সে তৃষ্ণার কান্না ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। উদ্দীপকেও কারবালার এ করুণ কান্নার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কারবালার কান্নার রোলে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রলয়ের শিঙ্গা যেন বিশ্ববিদীর্ণ করে উঠেছে। চারিদিকে হায় হোসেন, হায় হোসেন বলে রব উঠেছে। তাই বলা যায়, হৃদয়ভেদী হাহাকার প্রকাশের দিক থেকে ' মোহর্‌রম' কবিতা ও উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

উদ্দীপকে করুণ রস সঞ্চারিত হয়েছে কিন্তু 'মোহর্‌রম' কবিতাটি বীররসাত্মক।

'মহর্‌রম' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ত্যাগ ও বীরত্বের সমন্বিত চেতনা। নজরুল-মানসে মহর্‌রমের চেতনা রাজনৈতিক আবহ গ্রহণ করেছে। কবি চেয়েছেন মহররমের আত্মত্যাগ থেকে বাঙালি মুসলিম সমাজ শিক্ষা নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে। এ দেশের মুসলিম সমাজ আত্মত্যাগের শক্তি দিয়ে আপন দেশমাতাকে ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবে।

উদ্দীপকে কারবালা প্রান্তরের শোকের আবহ তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে হোসেনের শাহাদাৎ বরণে পৃথিবী জুড়ে শোকের মাতম উঠেছে। সৃষ্টিকে নাশ করতে প্রলয়ের শিঙ্গা বেজে উঠেছে। জগতের মানবকূল ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর চারিদিকে হায় হোসেন হায় হোসেন রব ধ্বনিত হচ্ছে। অন্যদিকে 'মোহর্‌রম' কবিতায় কবি শোককে শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছেন। কবি এই কবিতায় মর্সিয়া ক্রন্দন নয় মুসলিম জাতিকে দেশের জন্য একতাবদ্ধ হতে ডাক দিয়েছেন। কবির দৃষ্টিতে কারবালার তৃষ্ণা আজ মনুষ্যত্বের অপমানে জর্জরিত। স্বামীহারা সখিনার মর্মভেদী কান্না আজ স্বামী কাসেমের প্রাণ ফিরে পেতে চায় না। সে আজ চায় ইসলামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাসেমের মতো প্রাণ বলিদান।

উদ্দীপকে কারবালার ঘটনায় শোকের আবহ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু মোহর্‌রম' কবিতায় কবি শোককে রাজনৈতিক তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি সকলকে বীরের মতো লড়াই করতে ডাক দিয়েছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি করুণ রসাশ্রিত হলেও 'মোহর্‌রম' কবিতায় বীররস সঞ্চারিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ঐ শোনো কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে– 'তৃষ্ণা তৃষ্ণা।' কে দেবে এ তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ তৃষ্ণা আব-জমজম আবে কওসরেও মিটবার নয়। এ কারবালার মরুদগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল মুসলিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছ অরুণ খুনের তরুণ শহিদ মুসলিম, কাসেমের এ তৃষ্ণা এ ক্রন্দন-তিক্ততা মেটাবে। ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সখীনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাসেমের মতো প্রাণ-বলিদান।

ক. কারবালা প্রান্তরে হোসেন কার হাতে নিহত হন?

খ. 'ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।' –কেন? বিশ্লেষণ করুন।

গ. উদ্দীপকটি 'মোহর্‌রম' কবিতাকে কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কারবালা প্রান্তরের মর্মান্তিক ঘটনা 'মোহর্‌রম' কবিতা ও উদ্দীপকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. খ